অন্তর্জ্বালা

স্টিফান জাইগ

অন্তর্জ্বালা

অন্তর্জ্বালা

স্টিফান জাইগ

অনুবাদ

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিমিটেড
৮৯, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭

প্রথম প্রকাশ, ফাল্গুন ১৩৫৯

প্রকাশক
নির্মলকুমার সরকার
ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিমিটেড
৮৯, হ্যারিসন রোড,
কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর
সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রতিভা আর্ট প্রেস
১১৫-এ, আমহার্স্ট স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট
মনীন্দ্র মিত্র

প্রচ্ছদপট ব্লক ও মুদ্রণ
ফটোটাইপ সিণ্ডিকেট
১০, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

দাম দু'টাকা চার আনা

কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
অগ্রজপ্রতিমেষু

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বই

কবিতা

চন্দ্রসূর্য

গল্প

রাম-রহিম

রাত্রির আকাশে সূর্য

অনূদিত উপন্যাস

অন্তর্জ্বালা

গোধূলির গান

শাদা-কালো (যন্ত্রস্থ)

১৯৪২ খৃস্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী পৃথিবীর ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন বলে গণ্য হয়ে থাকবে কি ?

হয়ত হবে না।

হয়ত নিরাশ্রয় ক্লান্ত হতাশ এক সাহিত্য-সাধকের পৃথিবী থেকে স্বেচ্ছায় শেষ বিদায় নেওয়ার দিন হিসাবে, শুধু সাহিত্য-রসিকদের কাছেই এ তারিখটির যা কিছু করুণ মূল্য থাকবে।

সুদূর ব্রেজিলের নাতিপরিচিত একটি শৈলাবাস-নগরে ওই তারিখে ইউরোপের নমস্য একজন সাহিত্যাচার্য সস্ত্রীক আত্মহত্যা করেন।

শৈলাবাস-নগরটির নাম পেট্রোপলিস এবং সাহিত্যাচার্যের নাম স্টেফান ৎসোয়াইগ্।

ঠিক সাধারণ ছকে ফেলে ৎসোয়াইগ্-দম্পতির এ আত্মহত্যার বিচার সেরে ফেলা যায় না।

পরিণত যাট বৎসর বয়সে ৎসোয়াইগ্ যখন নিজের জীবনে স্বেচ্ছায় শেষ দাঁড়ি টেনে দেন তখন পৃথিবীর ওপর বিতৃষ্ণা আসবার মামুলি কোন কারণ তাঁর ছিল না। অর্থের অভাব তাঁর

তখন নেই, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য তখন তাঁর অটুট, পাশে তাঁর তরুণী সহধর্মিণী এবং খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে তখন তিনি পৌঁছেছেন।

তবু কেন যে বেঁচে থাকার তাগিদ তিনি আর নিজের মধ্যে পেলেন না, শেষ একটি ঘোষণায় তিনি তা জানিয়ে গেছেন। তিনি লিখে গেছেন :—

"স্বেচ্ছায় সুস্থমস্তিষ্কে এ জীবন থেকে বিদায় নেবার আগে একটি শেষ কর্তব্য আমি সমাপন করে যেতে উদ্‌গ্রীব। আমার সাধনা নিয়ে আমি এমন মধুর আতিথ্যের আশ্রয় যেখানে পেয়েছি, সেই অপরূপ দেশ ব্রেজিলকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা আমি জানিয়ে যেতে চাই। দিনের পর দিন এ দেশের প্রতি অনুরাগ আমার গভীরতর হয়ে উঠেছে। নিজের মাতৃভাষার জগৎ যখন আমার কাছে মৃত, আমার অধ্যাত্ম স্বদেশ ইউরোপ নিজেকে নিজে ধ্বংস করতে মত্ত, তখন সানন্দে নিজের জীবন আবার নতুন করে গড়বার এর চেয়ে ভালো জায়গা আমি কোথাও পেতাম না।

কিন্তু ষাট বৎসর পার হবার পর একেবারে নতুন করে জীবন সুরু করবার জন্যে বিশেষ শক্তি থাকা দরকার, এবং সুদীর্ঘ কাল গৃহহারা হয়ে নিরুদ্দেশ পর্যটনে আমার সমস্ত ক্ষমতা নিঃশেষিত। তাই, যে জীবনে ধী-বৃত্তিই আমার কাছে

অনাবিল আনন্দের উৎস ছিল এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠসম্পদ বলে যেখানে আমি মনে করতাম, সময় থাকতে সসম্মানে সে জীবন শেষ করে দেওয়াই ভালো বলে মনে হয়। আমার সমস্ত বন্ধুদের আমি শুভেচ্ছা জানাই। দীর্ঘ রাত্রি পার হবার পর তারা যেন প্রথম উষালোক দেখে যাবার মত পরমায়ু পায়। নিতান্ত অধীর আমি, তার আগে একাই চললাম।"

স্টেফান ৎসোয়াইগ্,

পেট্রোপলিস, ২২. ২. ৪২

আত্মঘাতীর এমন আশ্চর্য স্বীকৃতি-পত্র পৃথিবীতে আর কোথাও কখনও অবশ্য দেখা যায়নি। উন্মত্ততা নেই, জ্বালা নেই, বিদ্বেষ নেই, এমন কি যাদের অমানুষিক নিষ্ঠুরতা তাঁর এই নিদারুণ পরিণামের জন্যে দায়ী, তাদের বিরুদ্ধে একটু তিক্ততা পর্যন্ত তিনি জীবনের শেষ উচ্চারণে রেখে যান নি।

এ ঘোষণা পড়বার পর তাই হঠাৎ মনে হয় স্টেফান ৎসোয়াইগের নয়, এ বুঝি সুদূর প্রবাসে ইউরোপেরই আত্মহত্যার স্বীকৃতি-পত্র। ৎসোয়াইগ্ যাকে তাঁর অধ্যাত্ম স্বদেশ বলেছেন সে ইউরোপ রেনেসাঁসের ইউরোপ, চতুর্দশ শতাব্দী থেকে যার মধ্যে নব-জাগরণের জোয়ার এসেছিল বলা যায়। জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্প সাহিত্য এবং তার চেয়েও বেশি, মানব-সত্যের সন্ধানে সে ইউরোপের অক্লান্ত কঠোর তপস্যা সমগ্র বিশ্বের বিস্ময়। তার

দুরন্ত প্রাণ-শক্তির প্রাচুর্য দুঃসাহসিক অভিযানে দিকে দিকে মানব-মনের সীমা বিস্তৃত করে দিয়েছে, ভাবীকালের এমন স্বপ্ন সে ইউরোপ দেখেছে মানবতার অসীম সম্ভাবনা যার মধ্যে চরিতার্থ।

ইউরোপের এই প্রাণ-বেগের মধ্যেই কিন্তু কোথায় ছিল এমন আত্মঘাতী সঙ্কীর্ণ স্বার্থের বীজাণু যা তার জীবনধারাকে বিষাক্ত করে তুলে আজ ধ্বংসোন্মুখ করে তুলেছে।

এক মহাযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হয়েও সে ইউরোপ কোন রকমে দাঁড়িয়ে উঠেছিল কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তাকে বুঝি চরম আঘাত দিয়ে গেছে।

মৃত্যুর পূর্বাহ্নে ৎসোয়াইগের শেষ নিবেদনে তাই ইউরোপের অন্তিম বিলাপই যেন আমরা শুনতে পাই। ৎসোয়াইগ্ অমা-নিশায় আচ্ছন্ন ইউরোপের শেষ মানব-সত্য-সন্ধানীদের প্রধানতম একজন সাহিত্যাচার্য। যে ইউরোপ চিরকাল সমস্ত পৃথিবীর শ্রদ্ধেয় হয়ে থাকবে তাকে জানতে হলে ৎসোয়াইগের সঙ্গে পরিচিত আমাদের হতেই হবে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

Stefan Zweig-এর উচ্চারণ স্টেফান ৎসোয়াইগ্। বাংলায় তিনি স্টিফান জ্বাইগ রূপে পরিচিত বলে প্রচ্ছদে তাই ব্যবহৃত হল।—প্রকাশক

এক

সেমারিং স্টেশনে পৌছে প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি দিয়ে এঞ্জিনটা থেমে পড়ে। ঝিরঝিরে পাহাড়ী হাওয়ায় কামরাগুলো খানিক জিরিয়ে নেয়। তারপর দুচারজন যাত্রীকে উগড়ে দেয়, গলাধঃকরণ করে আগন্তুক জনকয়েককে। ইতস্তত হৈচৈ।

ফের এঞ্জিন গর্জে ওঠে। তারপর অতিকায় এক অজগরের মত ট্রেণটাকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে এঁকেবেঁকে অদৃশ্য হয়ে যায় টানেলের অন্ধকারে।

ট্রেণ থেকে যারা নামল তাদের মধ্যে একজন বয়েসে তরুণ, সুদর্শন। বেশভূষায় পারিপাট্য আছে, চালচলনে রীতিমত স্মার্ট। খোশ মেজাজে সকলের আগে আগে এসে সে গাড়ির স্ট্যাণ্ডে উপস্থিত হল। তারপর গাড়ি একটা ঠিক করে গাড়োয়ানকে হোটেলের নামটা জানিয়ে দিল।

বাতাসে বসন্তের সুর। শাদা শাদা খণ্ড খণ্ড মেঘের মিছিল আকাশের নীলে। মাঝে মাঝে চোখের আড়াল হয়—দিগন্তবিস্তৃত পাহাড়ের অন্তরালে। সেখান থেকে উঁকিঝুঁকি মারে, কখনো-বা একেবারে উধাও,

আবার শ্বেতশুভ্র ফুলের স্তবকের মত পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় ভাসতে থাকে কখনো কখনো।

হোটেলে পৌঁছেই যুবকটি প্রথমে অতিথিদের নামের তালিকায় চোখ বুলোয়। কিন্তু একটা চেনা নামও তার চোখে পড়ে না।

—কেন যে মরতে এখানে এলাম! আপন মনেই সে আফশোষ করে, মনের মত কোন সঙ্গী না পেলে এখানে থেকেই বা করব কি ছাই! একটা ছুটিও যদি ফুর্তি করে কাটান ভাগ্যে জোটে! জানাশোনা কারো নাম দেখলাম না। নিদেন এক-আধটা মেয়ের নামও যদি থাকত, এ ক'টা দিন তাহলে অন্তত খুন্‌সুটি করে কাটান যেত। ধ্—ৎ!

যুবকটি অস্ট্রিয়ার এক অভিজাত বংশের ছেলে। সরকারী চাকুরে। নাম ব্যারণ অটো ভন স্টার্ণফেল্ড। বিশ্রামের প্রয়োজনে সে এখানে আসেনি, — বন্ধুবান্ধব সকলে যখন ছুটিতে ফুর্তি করতে বেরিয়ে গেল, স্টার্ণফেল্ড ভাবল, ও-ই বা কেন পড়ে থাকে?

অবিকল আর দশটা মানুষের মত না হলেও স্টার্ণফেল্ডও মানুষ,— সকলের পরিচিত এবং প্রিয়। চুপচাপ একা-একা থাকা ওর ধাতে সয় না, একটুতেই হাঁপিয়ে ওঠে। তাই নিঃসঙ্গ ও কখনো থাকতে চায় না। এ ছাড়াও একটা কারণ অবিশ্যি আছে —পাঁচজনকে নিয়ে জমাতে না পারলে মনটা ওর খাঁ-খাঁ করে, আড্ডার আয়নায় ছাড়া নিজেকে ও খুঁজে পায় না। অর্থাৎ মানুষটা আসলে আমুদে। এমনিতে মনে হয় বোকাসোকা, নিষ্প্রাণ, নির্জীব, —কিন্তু অন্যের, বিশেষ করে মেয়েদের ঘনিষ্ঠে এলেই ওর সুপ্ত প্রতিভা যেন ফেটে বেরোয়, হৃদয়ের চাপা আগুন

হাজারো শিখায় জলে ওঠে। সত্যিকারের মানুষটার পরিচয় শুধু মেলে তখনই।

নিরুৎসাহ হয়ে নির্জন লাউঞ্জে স্টার্ণফেল্ড পায়চারী করতে থাকে। হয়ত খবর-কাগজটা একবার উল্টে দেখে বা কোন মাসিক পত্রিকার পাতা উল্টোয়। মিউজিক রুমে এসে পিয়ানোর সামনে বসে একবার। কিন্তু আঙুলগুলো যেন অসার আড়ষ্ট হয়ে গেছে। সুরটা আসি-আসি করেও আসছে না। সবশেষে হতাশ হয়ে সে একটা ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইল। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে, সামনে পাইনের বনে অন্ধকার ক্রমশ গাঢ়-গভীর হয়ে উঠছে। পুরো একটি ঘণ্টা সে পাইনবনের ছায়া-কালো-কালো গাছগুলির দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ডাইনিং রুমের দিকে রওনা হল।

গুটিকয় টেবিলে জনাকয় খেতে বসেছে। স্টার্ণফেল্ড চকিতে একবার সকলের ওপর চোখ বুলিয়ে নেয়, যদি একটা চেনা মুখ চোখে পড়ে! কিন্তু, যদিই বা চেনা মুখ একটা বেরোল, হা হতোস্মি, এ চেনা না-চেনার শামিল। জানোয়ারদের ট্রেণিং দিয়ে সজুত করা এই চেনা লোকটার পেশা। মেয়ে একটিও নাস্তি। জমানো যায় এমন একজন ভদ্দরলোকও চোখে পড়ল না। বিরক্তিতে, হতাশায়, অধৈর্যে একেবারে মুষড়ে পড়ে স্টার্ণফেল্ড।

দুনিয়ার বাজারে চেহারাই যাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ, স্টার্ণফেল্ডকে তাদের দলে ফেলা যায়। সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র, প্রথম দর্শনেই সে সকলের মন কাড়ে। স্টার্ণফেল্ড তা জানে — এবং জানে বলেই এটাকে মূলধন করে নিত্যনতুন অভিজ্ঞতা খুঁজে বেড়ায়। সব সময় স্বসচেতন,

কোন সুযোগ যাতে কোনমতে না ফসকায় হুঁশিয়ার সর্বদা। মদন-দেবতা যেন তার হাতের লোক, কারো সঙ্গে প্রথম আলাপেই তিনি জানিয়ে দেন কতখানি সুবিধে হবে না হবে। বন্ধুর বউই হোক কি বাড়ির ঝিই হোক,—মেয়ে দেখলেই স্টার্ণফেল্ড তাকায়, অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে মেয়েটির মনের গভীর পর্যন্ত দেখে নেয়, চোখের চাউনীতেই নিজের মতলব জানিয়ে দেয়। অর্থাৎ সে একটি 'গে লোথারিও'। আর গুণ না থাকুক ছাড়-গুণগুলি তার আছে — একই সঙ্গে পরম প্রেমিক ও চরম নিষ্ঠুর।

মানে নারী-শিকারী।

একবার স্টার্ণফেল্ডের হাতে পড়লে সে-মেয়ের আর রক্ষে নেই, প্রেমের বানে হাবুডুবু তাকে খেতেই হবে। তবে এ প্রেম প্রেমিকের প্রেম নয়, জুয়াড়ীর প্রেম। এ প্রেম হিসেব করে করে, লাভ-লোকসান খতিয়ে নিয়ে পা বাড়ায়। পরিণাম তাই বড় ভয়ানক এ প্রেমের। কেউ কেউ জীবন ভোর করে দেয় এইভাবে, প্রেমের রণাঙ্গনে নিত্যনতুন অদম্য অভিযান চালিয়ে যায়,— পথ-চলতি এক ঝলক চাউনি, একটু হাসির ইশারা, পাশাপাশি টেবিলে হাঁটুতে হাঁটুতে ঈষৎ ছোঁয়া — এই রকম অসংখ্য ছোটখাট ঘটনা বা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এপিসোড দিয়ে জীবন ভরে তোলে। জীবনে এ তাদের বড় পরম ধন!

সেদিন সন্ধ্যায় ব্যারণ বাহাদুরের একটি খেলার সাথীও জুটল না। এবং নিষ্কর্মা বসে থাকতে হলে স্বভাবতই খেলোয়াড়দের মন-মেজাজ বিগড়ে যায়। চাকরকে দিয়ে সে খবর-কাগজ আনিয়ে নিল। তন্ন-তন্ন করে কাগজের প্রত্যেকটি লাইন-হেডলাইন পড়তে লাগল, কিন্তু চোখ দিয়ে

পড়লে কি হবে, মন তার অন্যত্র — মদের আমেজে রিমঝিম, নেশার স্বপ্নে ঢুলুঢুলু।

হঠাৎ এক সময় পিছনে স্কার্টের মৃদু খসখসানি, তারপর সুস্পষ্ট কোমল স্নেহবিগতি স্বর—

'কী দুষ্টুমি হচ্ছে এডগার!'

দীর্ঘাঙ্গী, সুতনু, সুবেশিনী এক মহিলা পাশ দিয়ে চলে গেলেন। তাঁর পিছনে একটি ছেলে—পাণ্ডুর মুখ, দুই চোখে যেন কৌতূহল উপচে পড়ছে। তার এই কৌতূহলের জ্বালাতেই বোধ হয় ভদ্রমহিলার উপরোক্ত মন্তব্য।

একটি টেবিলের সামনে গিয়ে দুজনে বসল। ছেলেটি অর্থাৎ শ্রীমান এডগার অবিশ্যি যথেষ্ট ভব্যসব্য হবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু দুই চোখের চঞ্চল গতিবিধিতে তার আসল পরিচয় স্পষ্ট।

ব্যারণের চোখ মহিলাটির ওপর — সুন্দর স্বাস্থ্য, চমৎকার চেহারা, প্রসাধনে-সাজে-পোশাকে মার্জিত রুচির ছাপ। এক কথায় মনোলোভনা। এই ধরণের মেয়েদেরই ছেলেরা বেশী পছন্দ করে। সদ্য-কৈশোরোত্তীর্ণ ডানাকাটা পরীও নয়, আবার দেহে ভাঁটার টানও লাগেনি। প্রেমের খেলায় এরা এখনো সমান তালে চলতে পারে। বাইরের এই সাজ-পোশাকে স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তিটা চাপা পড়ে আছে মাত্র। ছাই-চাপা আগুন যথা।

প্রথম-প্রথম চেষ্টা করেও সে ভদ্রমহিলাকে চোখাচোখি চাওয়াতে পারল না, ইচ্ছে করেই যেন তিনি নতমুখী, অন্যমনা। স্টার্ণফেল্ড কিন্তু অপলক। আশ্চর্য ভ্রধনু, তিলফুল জিনি নাসা, মুখের আদলটিও —

আহা, মরি মরি! সুকেশিনী। ঘাড়ের কাছ থেকে চুলের ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছে পিঠময়। যেসব মেয়ের দিকে একবার তাকালেই বুকের রক্ত ছলাৎ করে ওঠে ইনি তাদেরই অন্যতমা। চাকরকে যখন হুকুম করেছেন বা ছেলের সঙ্গে কথা বলেছেন, গলা দিয়ে যেন মধু ঝরছে! ছেলেটা টেবিলের ওপর কাঁটা-চামচ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছে দেখে তাকে সুস্থির হয়ে বসতে বললেন। কী মৃদু, কী মিষ্টি গলার স্বরটি! আশে-পাশে কোনদিকে, এমন কি স্টার্ণফেল্ড তাকিয়ে আছে সেদিক পর্যন্ত, যেন বিন্দুমাত্র হুঁশ নেই। এমনই নির্বিকার!

আসলে কিন্তু স্টার্ণফেল্ডের এই বেহায়াপনা তাঁর মনকেও নাড়া দিয়েছে।

স্টার্ণফেল্ডের মনের ভার লাঘব হয়ে যায়। চোখ জ্বলজ্বল, মুখ উজ্জ্বল। এতক্ষণের হতাশা আর বিরক্তির ভাবটা বেমালুম উধাও। পেশীতে পেশীতে চাঞ্চল্য জাগে, রক্তে ঢেউ ওঠে, কয়েক মিনিটে জন্মান্তর ঘটে যেন। দুই চোখের তারা থেকে থেকে ঝিলিক দেয়। জৈব খিদেটা মাথা তোলে। শিকারের সন্ধান পেয়েছে ঝানু শিকারী। চোখের ভাষায় সে প্রতিদ্বন্দ্বীকে চ্যালেঞ্জ জানায়।

কিন্তু ভদ্রমহিলা চোখ ঘোঁচ করে একবার তার দিকে তাকিয়েই মুখ ফেরান, মানে চ্যালেঞ্জটাকে স্রেফ বরবাদ করে দেন। তবু যদি ঠোঁটের কোণে চাপা হাসির ঈষৎ ইশারা চোখে পড়ে। স্টার্ণফেল্ড ঠায় তাকিয়ে থাকে। কিচ্ছুই বুঝে উঠতে পারে না, এবং বুঝে উঠতে পারে না বলেই ভেতরে ভেতরে আরো বেশী করে তার উত্তেজনার জোয়ার আসে।

এটা তো ঠিক যে ভদ্রমহিলা সাহস করে তার চোখে চোখে চাইতে পারছেন না? ব্যস! সূচনা শুভ। এর একটা মানে যেমন করা যায় যে, উনি তাকে সরাসরি অস্বীকার করছেন, তেমনি তার সামনে লজ্জায় থতমত খাচ্ছেন, এও তো হতে পারে? এই লজ্জাটি বড় ভালো লক্ষণ।

তাছাড়া, ছেলের সঙ্গে যেভাবে মেপে মেপে কথা কইছেন এতেই তো বোঝা যায় স্টার্ণফেল্ডের উপস্থিতি সম্পর্কে তিনি পুরোমাত্রায়, চাই কি অতিমাত্রায়, সচেতন।

প্রথম প্রথম এ রকম অস্বস্তি জাগে, হ্যাঁ, স্টার্ণফেল্ড কি আর তা না জানে, না বোঝে না কিছু!

স্টার্ণফেল্ডের রক্ত টগবগাচ্ছে।

খেল্ শুরু হয়ে যায়। তারিয়ে তারিয়ে প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে সে খেয়েই চলে। খাবার প্লেটে নয়, ভদ্রমহিলার ওপর দুই চোখ তার নির্ণিমেষ। পা-থেকে-মাথা মাথা-থেকে-পা — দেহের প্রতিটি অংশ, প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বারবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে।

বাইরে ঘনঘোর অন্ধকার, অন্ধকারের সমুদ্রে সবকিছু অতলান্ত। ঘরের কোণায় কোণায় কোণ নিয়েছে অন্ধকার। স্তব্ধ চারদিক। স্টার্ণফেল্ডের মনে হয়, এই স্তব্ধতাকে ভাঙবার জন্যেই যেন ভদ্রমহিলা হঠাৎ বড় বেশী কথা বলতে শুরু করেছেন ছেলের সঙ্গে। মাপাজোকা, ভেবে-ভেবে তৈরী করা কথা — অসংবদ্ধ, অসংলগ্ন। কিন্তু এ ভাবে আর কতক্ষণ চলে শুধু — চোখের খিদে মেটানো?

হঠাৎ স্টার্ণফেল্ডের মাথায় একটা মতলব আসে।

উঠে দাঁড়ায়, ভদ্রমহিলার দিকে দৃকপাত না করে জানালা বরাবর তাকাতে তাকাতে আস্তে আস্তে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। এবং গিয়েই হুট করে ফের ঘরে ঢোকে, যেন কিছু একটা ভুলে ফেলে গেছে, নিতে এসেছে।

হাতেনাতে ধরা পড়ে যান ইনি — দরজায় তার গমনপথের দিকেই অসীম কৌতূহলে তাকিয়ে ছিলেন। একেবারে চোখাচোখি হয়ে যায়।

স্টার্ণফেল্ডকে আর পায় কে! কিস্তিমাৎ, মতলব হাসিল।

হলঘরে এসে প্রত্যাশায় সে বসে রইল। একটু পরেই ছেলের হাত ধরে শ্রীমতীর আগমন ঘটল। যেতে যেতে বড় টেবিলটার সামনে দাঁড়িয়ে ছেলেটিকে একটা ছবিওলা মাসিকের পাতা উল্টে উল্টে তিনি ছবি দেখাতে লাগলেন। এদিকে স্টার্ণফেল্ডও যেন নেহাৎ খবর-কাগজ পড়বার জন্যেই উঠে এল সেই টেবিলের পাশে।

আর একবার চোখাচোখি হয় না? মুখের একটা কথা শোনার ভাগ্যি তা না হয় এখন না হল, কিন্তু চোখাচোখিটা আর একবার···?

ভদ্রমহিলা হঠাৎ পাশ ফিরে দাঁড়ালেন, ছেলের কাঁধে হাত দিয়ে বললেন—

'আর নয়, চল বাবা, রাত হয়ে যাচ্ছে।'

ছেলেকে নিয়ে তাড়াতাড়ি তিনি চলে গেলেন।

অহো, কী নিষ্ঠুর! তাঁর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে স্টার্ণফেল্ড ভাবে। বড় আশা ছিল, আজ রাত্তিরেই আলাপ-পরিচয়টা, মানে ভূমিকাটা, অন্তত সেরে রাখবে। সে-আশায় ছাই পড়ায় বড়ই সে ক্ষুব্ধ হয়।

তবে হ্যাঁ, এও এক ধরণের বচিত্র্য বই কি। একঘেয়ে এলাম-দেখলাম-জয় করলাম-এর চাইতে এ ধরণের বৈচিত্র্য মাঝে মাঝে মন্দ না। বাসনাটা আরো জোরালো হবার অবসর পায় এক্ষেত্রে।

যাক, মনে মনে স্টার্ণফেল্ড নিজেকে সান্ত্বনা দিল, ছুটিটা তাহলে একেবারে নিরামিষ বোধ হয় যাবে না। একজন প্রতিদ্বন্দ্বী অন্তত পাওয়া গেছে, এরপর খেল্ একহাত সে দেখাতে পারবে আশা করা যায়।

দুই

পরের দিন সকাল।

হলঘরে ঢুকে স্টার্ণফেল্ড দেখে, ছেলেটি হোটেলের দুজন চাকরের সঙ্গে আলাপে মশগুল। দুজনে মিলে ছেলেদের একটা বই থেকে ছবি দেখিয়ে দেখিয়ে তাকে সমঝে দিচ্ছে। শ্রীমতী অনুপস্থিত, ধরে নেয়া যায় এখনো তিনি প্রসাধন সমাপনে ব্যস্ত।

এই প্রথম স্টার্ণফেল্ড ভালোভাবে ছেলেটিকে লক্ষ্য করল। বয়েস আন্দাজ বছর বারো, রুগ্ন শরীর, লাজুক, ছটফটে, নার্ভাস প্রকৃতির এক কিশোর। অতল চোখ জোড়া হর্দম ঘুরপাক খাচ্ছে। হঠাৎ যেন কেউ তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে এনে এখানে—এই অপরিচিত পরিবেশে—দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। অস্বস্তিতে কেবলই তাই এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। সাজসজ্জা জমকালো, মুখখানি একেবারে সরল—কৈশোর ও যৌবনের অন্তর্বিরোধের ছাপ এখনো পড়েনি। অবাড়ন্ত দেহ। গায়ের সাজ-পোষাক দেহের তুলনায় বড়, মনে হয়, আর কারোটা বুঝি চাপিয়ে এসেছে। রোগারোগা প্যাকাটিসদৃশ হাত-পা ট্রাউজার ও জ্যাকেটের

মধ্যে লটপট করছে। মুখ দেখেই বিমুখ হতে হয়।

গাছের ফলটিকে দেখে স্টার্ণফেল্ড বড়ই হতাশ হল।

ছেলেটা এদিক-ওদিক ঘুরঘুর করতে থাকে। হোটেলের চাকরটা হয়ত একবার হাত ধরে সরিয়ে দিল তো দাঁড়াল এসে দরজার সামনে। সেখানে কেউ চোখ পাকাল তো ঘুরে গেল আরেক দিকে। বাইরের ছুনিয়ার সঙ্গে তার সম্পর্ক কম। একে-ওকে অনর্গল প্রশ্ন করে করে সেটা পুষিয়ে নিতে চায়। কারো খুশি হল তো দাঁড়িয়ে ছুচারটা প্রশ্নের জবাব দেয়, নইলে মুখ ফিরিয়ে চলে যায় যে যার নিজের কাজে।

আহা! দেখে-শুনে মায়া হয় স্টার্ণফেল্ডের। সবকিছু জানার কী কৌতূহল, জবাবে জুটছে শুধু মুখঝামটা! কিন্তু আবার যদি টের পায় যে তার কৌতূহল অন্য কারো কৌতূহল জাগিয়ে তুলছে, সঙ্গে সঙ্গে অমনি লজ্জা পেয়ে পিট্টান দেয়। চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে যেন ধরা পড়ে গেছে।

বিচ্ছুটার রকম-সকম দেখে স্টার্ণফেল্ডের মজা লাগে। হঠাৎ একটা মতলব তার মনে উঁকি দিয়ে যায়— আচ্ছা, এর সঙ্গে আগে জমিয়ে নিয়ে সেই সূত্রে মা'র কাছে ভেড়বার চেষ্টা করলে কেমন হয়, অ্যাঁ? আহা, দেখাই যাক না চেষ্টা করে।

স্টার্ণফেল্ড এডগারকে ফলো করে।

বাইরে একটা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল, এডগার এসে ঘোড়াটার সঙ্গেই খুনসুটি শুরু করে দেয়। কিন্তু এমনই কপাল, ঘোড়ার হেনেস্তাও গাড়োয়ানের সইল না। ধমকে তাকে সরিয়ে দিল। বেকুব বনে গিয়ে

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল এডগার। এখন তাহলে কি করবে সে? কি করে সময়টা এখন কাটাবে? বেচারা!

সুযোগ বুঝে স্টার্নফেল্ড এগিয়ে আসে। খোশ মেজাজে বলে, 'এই যে খোকা, কেমন লাগছে জায়গাটা?'

ছেলেটির চোখমুখ লাল হয়ে ওঠে, বিব্রতভাবে মুখ তুলে তাকায়। থতমত ভাবটা কাটাবার জন্যে ট্রাউজারে হাত ঘসতে থাকে। জীবনে এই প্রথম একজন ভদ্দরলোক তার সঙ্গে সেধে কথা কইছেন!

'চ-চমৎকার!' কোনমতে সে জবাব দেয়। 'ন-ন-নমস্কার।' বিশেষ জোর দিয়ে শেষ কথাটা আওড়ায়।

'অবাক করলে ভাই! আমার তো মনে হয় এ এক ভারি বিতিকিচ্ছিরি জায়গা, তোমার মত ইয়াংম্যানদের যে কি করে এ জায়গা ভালো লাগে বুঝি না। ভালো লাগার মত কিই বা আছে এখানে!'

আনন্দে উত্তেজনায় এডগারের মুখে হঠাৎ কথা জোগায় না। কি আশ্চর্য, কেউ তার দিকে ফিরে চায় না পর্যন্ত, আর এই ভদ্দরলোক কিনা সেধে এসে তার সঙ্গে আলাপ করছেন? ভাই বলে কথা কইছেন? তার মতামত জানতে চাইছেন এই জায়গাটা সম্বন্ধে? একই সঙ্গে লজ্জায় আর গর্বে তার ছোট্ট বুকখানি ফুলে ওঠে।

অনেক কষ্টে শেষ পর্যন্ত এডগার গড়গড় করে বলে যায়, 'আমার বড্ড অসুখ হয়েছিল কিনা, তাই মা আমায় এখানে বেড়াতে নিয়ে এসেছেন। জানেন, ডাক্তারবাবু বলেছেন আমার অনেক-ক্ষণ সূর্যের আলোয় স্নান করা উচিত। ওই যে যাকে সান-বাথ বলে না?— তাই।' কথা বলবার সময় তার স্বরে গদগদ ভাবটা বড় বেশী ফুটে ওঠে।

ভীষণ খুশিখুশি দেখায়। কেননা, সাধারণত অসুখে পড়লে ছেলেরা খুশিই হয়, মনে করে — অসুখে পড়েছে বলে বাপ-মা আত্মীয়স্বজনের কাছে তাদের দাম বেড়ে গেছে আচমকা, নইলে বড়রা পাত্তা দেয় নাকি ছোটদের।

'তা যা বলেছ! তোমার মত একজন ইয়াংম্যানের পক্ষে সূর্য-স্নান আবিশ্যি খুবই উপকারী। কিন্তু সারাদিন চুপচাপ বসে থাক কেন? উঠতি বয়েস, বেশ বড়সড়টিও হয়ে উঠেছ — এখন খুশিমত হইচই করে বেড়াবে, তবেনা!' একটু হেসে স্টার্ণফেল্ড আবার বলে, 'তুমি বড্ড বেশী ভালো ছেলে, এত ভালো হওয়া কিন্তু ভালো নয়, যাই বলো! মনে হয়, সব সময় যেন তুমি বই-এ মুখ গুঁজে বসে থাক। অথচ, তোমার বয়েসে আমি কী দুরন্তই ছিলাম...সে সব কথা যখন ভাবি — জানো, রোজ সন্ধ্যায় যখন বাড়ি ফিরতাম— জামাকাপড় ছিঁড়ে-খুঁড়ে একসা! কী দুষ্টু যে ছিলাম!'

এডগারের মুখখানি হাসিতে ভরে ওঠে, থতমত সলজ্জ ভাবটা কেটে যায়। স্টার্ণফেল্ডের কথার জবাব দেবার ইচ্ছে হয়, কিন্তু পাছে কি বলতে কি বলে ফেলে সেই ভয়ে চুপ করে থাকে। ভাবে, ভদ্দরলোক কী ভালো মানুষ। ওঁর পরনের পোশাকটি কী সুন্দর! কত স্মার্ট! কেমন একবয়েসী বন্ধুর মত কথা কইছেন আমার সঙ্গে! খুশিতে এডগার উপছে ওঠে, তারও ইচ্ছে করে সমানতালে কথা বলে যায়।

কিন্তু জিব যে রা কাড়ে না, ভাবনাগুলি যে কেবলই ঘুরপাক খায় মনের মধ্যে!

একুশ

ভাগ্যি ভালো, হোটেল-ম্যানেজারের কুকুরটা সেই সময় তাদের পাশে এসে গা শুঁকতে থাকে। দুজনেই একসঙ্গে কুকুরটাকে আদর করে পিঠ চাপড়ে দেয়।

'তুমি কুকুর পুষতে ভালোবাসো?'

'কুকুর? খুউব! আমার ঠাকুমার বাড়িতে একটা ভা-রি ভালো কুকুর আছে। ঠাকুমার কাছে গেলে না, আমি সারাদি-ন তার সাথে খেলা করে কাটাই। কিন্তু,' — একটু থেমে এডগার বলে, 'কিন্তু বছরে মাত্তর একবার আমরা সেখানে যাই!'

'আমার বাড়িতে অনে-কগুলো কুকুর আছে, তুমি চাও তো একটা তোমায় দিয়ে দিতে পারি— জন্মের মত। লালচে রঙের যেটা আছে, তার কানদুটি আবার শাদা—একেবারে শাদা। দেখতে? বিউ-টিফুল! এমনিতে ছোট্টটি, ওদিকে কিন্তু মহা ওস্তাদ। তুমি যদি চাও—'

মাত্রাছাড়ানো আনন্দে এডগারের চোখমুখ ঝলমল করে।

'বাঃ, কি মজা হবেরে!' খুশিতে সে হাততালি দিয়ে ওঠে। কিন্তু পরমুহূর্তেই মুখ তার অন্ধকার হয়ে আসে। বিষণ্ণ সুরে বলে, 'কিন্তু মা-মণি যে রাজি হবেনা! বাড়িতে কুকুর মা দুচোখে দেখতে পারেনা, – ঘরদোর এমন নোংরা করে বলে—'

স্টার্ণফেল্ডের ঠোঁটে চাপা হাসি, মনে রাজ্যজয়ের খুশি। যাক, কথায় কথায় আদৎ কথায় আসা গেছে এতক্ষণে!

'তোমার মা-মণি বুঝি খুব কড়া?'

এডগার কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকে, নতুন বন্ধুটিকে বিশ্বাস করা যায় কিনা আড়চোখে তাকিয়ে ভাবে। তারপর বেশ ভেবে-

চিন্তে জবাব দেয়, 'উহুঁ, মা-মণি কড়া না। বরং আমার অসুখ কিনা, তাই যা চাইব মা-মণি এখন আমায় তাই দেবে। কিন্তু কুকুর—'

'বেশ, তোমার হয়ে আমিই তাঁকে বলব'খন ?'

'আপনি ? আপনি বলবেন ? তাহলে তো গ্র্যা-ণ্ড হবে !' আনন্দে এডগার প্রায় চীৎকার করে ওঠে, 'আপনি বললে মা-মণি নিশ্চ-ই রাজি হয়ে যাবে। আচ্ছা, কুকুরটা কেমন দেখতে বলুন না ? কান দুটো শাদা, না ? আচ্ছা, ও সব কথা বুঝতে পারে, অ্যাঁ ?'

'স-ব বুঝতে পারে — তুমি যা বলবে তা-ই করবে, বলার আগেই ব'লে কত কাজ করে ফেলে — ভী-ষণ বুদ্ধি কিনা — এক্কেবারে তোমার মত !'

ছেলেটার আনন্দ-সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে স্টার্ণফেল্ড সাফল্যের গর্ব বোধ করে। লাজুক ভাবটা কেটে গেছে, ভয় বা উৎকণ্ঠার ছায়ামাত্র নেই, সত্যিকারের ছেলেমানুষী রূপটি এতক্ষণে ফুটে বেরিয়েছে। সেই বোকাসোকা ছেলেটা এখন চালাক চঞ্চল এক কিশোরে পরিণত। ঝর্ণার মত উচ্ছল।

ইশ্, গর্ভধারিণীও এখন এই রকমটি হন, তবেই না !

একসঙ্গে এক ঝাঁক প্রশ্ন করে বসে এডগার।

'ওর নামটা তো বললেন না।'

'ক্যারো।'

'ক্যারো ? ক্যারো ! বাঃ ! গ্র্যা-ণ্ড।' বারবার নামটা মনে মনে আবৃত্তি করতে থাকে এডগার। নিজের বন্ধু-ভাগ্যে মনে আর আনন্দ ধরে না।

এদিকে স্টার্ণফেল্ড সময় থাকতে কাজ গুছিয়ে নিতে চায়।

এডগারকে সে তার সঙ্গে বেড়াতে যাবার জন্যে বলল। দিনের পর দিন বন্ধ ঘরে আটকা থেকে থেকে এডগারও হাঁফিয়ে উঠেছিল। এক কথায় রাজি হয়ে গেল।

পথে এডগার অনর্গল কথা বলতে থাকে, স্টার্ণফেল্ডও সুযোগ ছাড়ে না। প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্যগুলি একটু একটু করে জেনে নেয়, কিছু না বুঝেই সরল মনে তার সব কথার জবাব দিয়ে চলে এডগার।

এক অভিজাত ইহুদী পরিবারে এড়গারের জন্ম, বাপ ভিয়েনার নামকরা উকিল। মা এই জায়গাটা তেমন পছন্দ করেন না, কথা বলবার একটা লোক নেই, সোসাইটি নেই, এ ক'দিনেই ভদ্রমহিলা তাই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। তা ছাড়া, বাপের সঙ্গে মা'র তেমন বনেও না।

স্টার্ণফেল্ড যেন একটু আশার আলো দেখতে পায়। আবার খানিকটা গ্লানিও জাগে — যাই বলো, কাজটা কিন্তু ভালো করছে না। ছেলেটা সরলভাবে তাকে বিশ্বাস করেছে, আর সে কিনা সেই সুযোগে তাদের হাঁড়ির খবর জেনে নিল!

এডগার তো খুশিতে ডগমগ, হাওয়ায় যেন ভর দিয়ে চলেছে। এর পরে আবার স্টার্ণফেল্ড যখন তার একটা হাত মুঠো করে ধরল, নিজেকে সে আর সামলাতে পারে না — বুক চিতিয়ে হাঁটতে থাকে। বয়স্কের সমমর্যাদা পেলে এরকম বুক-চিতিয়ে হাঁটার মত গর্ব ছেলেদের দেখা দেয়, দেয়াই স্বাভাবিক। নিজের বয়েসের কথা ভুলে যায় এডগার, সমবয়েসী বন্ধুর মত স্টার্ণফেল্ডের সঙ্গে বাক্যালাপ শুরু করে।

কথাবার্তায় বোঝা যায় ছেলেটা বেশ চালাক। সাধারণত রুগ্ন ছেলেরা বেশীর ভাগ সময় বড়দের সঙ্গে কাটায় বলে দেহের তুলনায় মনটা তাদের বেশী বাড়ে। এডগারও তার ব্যতিক্রম নয়। তাছাড়া বয়েস-আন্দাজে ছেলেটা একটু বেশী ভাবপ্রবণ, অতিরিক্ত স্বপ্নদর্শী। ভেবেচিন্তে হিসেব করে চলার বয়েস তার নয়, যখন যেদিকে ঝোঁকে একেবারেই ঝোঁকে, মুখ ফেরায় তো ফিরিয়েই থাকে — অত তালমাত্রা জ্ঞান এখনো হয়নি। ভেতরে একটা দুরন্ত কিশোর প্রাণ লুকিয়ে আছে, কথাবার্তায় সেটা বারবার উঁকিঝুঁকি দেয়। বাইরের জগতের চাপে হৃদয়বৃত্তিটা প্রকাশের পথ পাচ্ছে না, ভেতরে ভেতরে মাথা কুটে মরছে।

মুখে অশ্রান্ত আবোল-তাবোল বকে যায় এডগার।

কিছুক্ষণের মধ্যেই স্টার্ণফেল্ড এডগারের মনের মানুষ হয়ে পড়ল। এডগার একান্তভাবে তাকে বিশ্বাস করে বসল।

ছেলেটার অন্তরের অন্তস্থল পর্যন্ত দেখতে পায় স্টার্ণফেল্ড। ভাবে, ছেলেদের কী সহজেই না বশ করা যায়! কিন্তু আমরা, মানে বড়রা, ওদের বড় একটা পাত্তা দিইনে, এড়িয়ে চলি। অথচ একটু নিজের চেষ্টা করলেই না ওদের একেবারে হাতের মুঠোয় আনা যায়।

কৈশোরে ফিরে গেল স্টার্ণফেল্ড, গল্পগুজবে মত্ত হয়ে উঠল।

দুজনের মধ্যে বয়েসের ব্যবধান ঘুচে যায়, স্টার্ণফেল্ড যে তার থেকে অনেক বড় একথা আর একবারও মনে হয় না এডগারের। এতদিনে সে একটি মনের মত বন্ধু পেয়েছে, যাকে বলে সত্যিকারের বন্ধু — এমন বন্ধু তার আর একটিও নেই।

এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। তাই বিদায় নেবার সময় স্টার্ণফেল্ড যখন বলে আবার কাল তারা একসঙ্গে বেড়াতে বেরোবে, গর্বে বুক ফুলে ওঠে এডগারের। অতি আপনার জনের মত — বলা যায় সহোদর ভাইয়ের মত — তারা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেয়। বিদায়-ক্ষণটি এডগারের ছোট্ট জীবনের উজ্জ্বলতম স্মৃতি হয়ে দেখা দেয়!

ছেলেদের কী সহজেই না বশ করা যায়! এডগার চলে যায়, স্টার্ণফেল্ড অপলক তাকিয়ে থাকে।

যাক, মধ্যস্থ একজন পাওয়া গেছে। সেতুবন্ধন শেষ, এবার পার হতে পারলে হয়।

তার প্রত্যেকটি কথা ছেলেটা নির্ঘাৎ গিয়ে মাকে বলবে। ছেলের মারফৎ মা'র যা-সব প্রশংসা সে করেছে নিশ্চয় তা যথাস্থানে রিপোর্টেড হবে। 'তোমার মা'র মত মানুষ আর হয় না —' প্রতি কথার ফাঁকেই তো এই কথাটি একবার করে উচ্চারণ করেছে — ছেলে কি তা আর বলবে না মা কে!

একথা শুনে ভদ্রমহিলা কি করবেন?

কে জানে কি করবেন, কিন্তু যাই করুন, আগ বাড়িয়ে তার কিছু করার দরকার নেই। হয়ত আপনা হতেই নেমে আসবে বিধাতার বর — কে জানে! তার আপাতত চুপচাপ থাকাই বুদ্ধিমানস্থ লক্ষণ।

জানালা দিয়ে প্রকৃতির শোভা দেখে স্টার্ণফেল্ড, — জেগে জেগে স্বপ্ন দেখে, স্বপ্নের রোমন্থন করে। প্রত্যাশায় উদগ্র হয়ে ওঠে সমগ্র সত্তা। এক কিশোর সেতু রচনা করেছে তার আর একটি মেয়ের মধ্যে — যে মেয়েটির জন্যে শরীর তার সহস্রেন্দ্রিয় হয়ে উঠেছে, ব্যাকুল সারা হৃদয়-মন।

তিন

স্টার্ণফেল্ডের মনোস্কামনা পূর্ণ হল।

ইচ্ছে করেই সে একটু দেরী করে খেতে আসে।

এডগার আগে থেকেই খাবার টেবিলে বসে ছিল, নতুন বন্ধুকে দেখেই সে আনন্দে উঠে দাঁড়ায়। মা'কে কনুইয়ের খোঁচা দিয়ে চাপা স্বরে কি যেন বলে, চোখের ইশারায় স্টার্ণফেল্ডকে দেখিয়ে দেয়।

ভদ্রমহিলার মুখে রক্তাভা ফুটে উঠল, ছেলেকে ধমক দিয়ে ভদ্র হয়ে বসবার জন্যে বললেন। নিজে কিন্তু আড়চোখে তিনি বারবার তাকাতে থাকেন।

সুযোগ পেয়ে যায় স্টার্ণফেল্ড। একবার চোখাচোখি হতেই মাথা নুইয়ে নমস্কার জানিয়ে বসল। কত কালের যেন পরিচয় দুজনের, নতুন করে পরিচয় নিষ্প্রয়োজন — ভাবখানা এই।

এদিকে তার কায়দা-দুরস্ত চালচলনে ইনিও বিমুগ্ধ দৃষ্টি। প্রতি-নমস্কার জানান, কিন্তু মুখে একটিও কথা বলেন না, বরং খাবার থালায় আরো বেশী ঝুঁকে পড়েন।

এডগারের কথা অবিশ্যি আলাদা। স্টার্ণফেল্ডের দিকে চেয়ে আছে তো-আছেই, একবার নিজে থেকে কথা পর্যন্ত কইতে যায় — মা'র দিকে তাকিয়ে সামলে নেয়।

খাওয়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এডগারের ওপর আদেশ হল ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়বার।

কাকুতি-মিনতি করে এডগার, বায়না ধরে।

শেষ পর্যন্ত মা'র বুঝি দয়া হয়, স্টার্ণফেল্ডের সঙ্গে একবার কথা বলেই চলে যাবার অনুমতি পেল।

স্টার্ণফেল্ডের দিকে এডগার এগিয়ে যায়, হেসে স্টার্ণফেল্ড দুটো কথা বলে — তাইতেই সে কৃতকৃতার্থ।

হঠাৎ যেন কথাটা মনে পড়ে গেছে, স্টার্ণফেল্ড উঠে দাঁড়াল, এপাশের টেবিলের কাছে এসে ভদ্রমহিলাকে সবিনয়ে নিবেদন করল — ছেলেটি তাঁর ভারী ভালো, বেশ চালাক-চতুর, এমন ছেলের মা হওয়া বড় ভাগ্যের কথা। এডগারকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়ে আজকের সকালটা যে তার কী আনন্দে কেটেছে তা আর বলবার নয়!

স্টার্ণফেল্ডের প্রশস্তি শুনে খুশিতে লজ্জায় গর্বে এডগারের চোখমুখ লাল হয়ে ওঠে।

ছেলের স্বাস্থ্য সম্পর্কেও গুটিকয় প্রশ্ন করে স্টার্ণফেল্ড, ফলে মা'র আর এবার মুখ না খুলে উপায় রইল না। একটু একটু করে তখন বাধাটা ভাঙতে থাকে, বাধ-বাধ ভাবটা কেটে যায়। দুজনের মধ্যে সরাসরি কথা-বার্তা শুরু হয়।

হাঁ করে সব শোনে এডগার।

স্টার্ণফেল্ড নিজের নাম বলে, পরিচয় দেয়, শুনে ভদ্রমহিলা একটু নড়ে-চড়ে বসেন। মনের হদিশ পাওয়া শক্ত, তবে কান পেতে সব কথা তিনি শোনেন, যথারীতি ভদ্রতাও বজায় রেখে চলেন। অবশেষে একসময় ছেলের রুগ্ন স্বাস্থ্যের কথা বলে মাপ চেয়ে বিদায় চান।

এডগার বাধা দেয়। কি হয়েছে তার যে এখ্‌নি গিয়ে শুয়ে পড়তে হবে? হুঁঃ! সে ব'লে সারা বিকেল, এমন কি সারা রাত্তিরই বসে কাটিয়ে দিতে পারে! মা-মণিটা যেন কী!

কিন্তু মা-মণিটি ততক্ষণে বিদায় নেবার জন্যে স্টার্ণফেল্ডের দিকে করতল প্রসারিত করে দিয়েছেন, সসম্ভ্রমে নত হয়ে তাঁর করতল চুম্বন করছে বন্ধুবর।

বিছানায় শুয়েও এডগারের ঘুম আসে না। মাথার মধ্যে নানান চিন্তা, নানান কথা ঘুরপাক খায়। জীবনে যেন তার একটা নতুন কিছুর আবির্ভাব ঘটছে। এই প্রথম সে একটি বয়স্ক লোকের সাহচর্য পেল। আধো-ঘুম আধো-জাগরণের মধ্যে আপন কৈশোরের কথা সে ভুলে যায়, নিজেকে তার পূর্ণবয়স্ক এক মানুষ বলে মনে হয়। এতদিন তার কী দুঃখে কেটেছে! বাড়ির এক ছেলে, তার ওপর অসুখ বারোমাস লেগেই আছে। বাপ-মাকেই শুধু সব সময় পেয়েছে কাছে কাছে, তার ছোট্ট হৃদয়ের সমস্ত ভালোবাসা তাঁদের ওপরেই ঢেলে দিয়েছে — কিন্তু প্রতি-দানে পেয়েছে কতটুকুই বা! তার সাথী ছিল বাড়ির চাকর-বাকর। ওরা সাথী হতে পারে, বন্ধু কখনো না। তাই হৃদয় উন্মুখ হয়ে ছিল কাউকে একান্ত করে পাবার জন্যে, কারুর ওপর সর্বস্ব সমর্পণের জন্যে।

তাই না প্রথম দর্শনেই সে স্টার্ণফেল্ডকে ভালোবেসেছে, হৃদয় নিংড়ে দিয়েছে, তৃপ্তিতে সার্থকতায় মন তার ভরে উঠেছে কানায় কানায়।

অন্ধকারে শুয়ে আনন্দে চীৎকার করে উঠতে সাধ যায় এডগারের, — দু চোখ দিয়ে জলের ধারা নেমে আসে।

এ কেমন ধাঁধাঁ! তার নতুন বন্ধুটিকে সে মা, বাবা, এমন কি ভগবানের চেয়েও বেশী ভালোবেসে ফেলল!

বন্ধুর মুখখানি চোখের সামনে ভেসে ওঠে, এখ্খুনি একবার ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে বন্ধুকে। সারা দেহ-মন গুমরে ওঠে অসহ্য এক অস্বোয়াস্তিতে।

আমি ওঁর থেকে ক-ত ছোট, ওঁর বন্ধু হবার আমি যোগ্য নই — এডগার ভাবে — মাত্তর বারো বছর বয়েস আমার, এখনো ইশকুলে পড়ি — তাইত সকলে জোর করে আমায় আগেভাগে শুতে পাঠিয়ে দেয়। আমার মত এতো ছোট ছেলের উনি বন্ধু হতে যাবেন কোন্ দুঃখে! বন্ধু হিসেবে ওঁকে আমার কিইবা দেবার আছে……।

নিজের এই অক্ষমতার কথা ভেবে এডগারের সারা মন বিষাদে ভরে যায়, বন্ধুর কাছে মনের সব কথা খুলে বলতে না পারার মর্মবেদনায় হৃদয় আঁকুপাকু করতে থাকে।

ইশকুলের একবয়েসী কোন ছেলেকে ভালোবাসলে তাকে খুশি করবার উপায় তার জানা আছে। দুয়েকটা খেলনা দিয়েই তাকে কাছে টানা যায়।

কিন্তু এখানে? এখানে তো আর খেলনায় কোন কাজ হবে না। তাহলে? নিজের বন্ধুত্বের চিহ্ন হিসেবে কী উপহার দেবে সে তার

এই নতুন পাওয়া বন্ধুটিকে? কি করে প্রমাণ দেবে তার নিখাদ ভালোবাসার?

কেন যে মাত্র বারো বছর বয়েস হলো তার!

এডগারের কান্না পায়। বারো বছরের ছেলে হওয়ার চেয়ে দুঃখ আর কী আছে পৃথিবীতে! বড় হওয়ার, শক্ত-সমর্থ পূর্ণবয়স্ক মানুষ না হওয়ার আফসোসে বারো বছরের ছেলেটির সমস্ত অন্তরাত্মা হাহাকার করে ওঠে।

…… স্বপ্ন দেখে।

এডগার স্বপ্নে দেখে, তার মনের কামনা সফল হয়েছে, পূর্ণবয়স্ক এক মানুষে পরিণত হয়েছে সে। স্বপ্নের পাখায় ভর দিয়ে মন তার নিরুদ্দেশ পাড়ি জমায় …… ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রঙ।

সকাল সাতটায় সে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে। ইশ, কত বেলা হয়ে গেছে! তাড়াতাড়ি জামাকাপড় পরে নিয়ে মা'র ঘরে এসে ঢোকে।

ছেলেকে আজ এত সকাল সকাল উঠতে দেখে মা যত না খুশি তার চেয়ে অবাক বেশি। অন্যদিন তাকে বিছানা থেকে টেনে তুলতে হয়, নিজে হাতে চোখমুখ ধুইয়ে জামাকাপড় পরিয়ে জোর করে খাওয়াতে বসাতে হয়। আর আজ কিনা সে—!

মা কোন কথা জিজ্ঞেস করবার আগেই এডগার ঘর থেকে তিন লাফে

বেরিয়ে যায়। তারপর খাবার ঘরে ঢুকে কোনমতে তাড়াতাড়ি কিছু মুখে দিয়ে নিয়ে হলঘরে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। বন্ধুর প্রতীক্ষা করে। বন্ধু যে আজও তাকে বেড়াতে নিয়ে যাবে বলেছে।

বেলা নটা পর্যন্ত সে হলঘরে পায়চারী করেই কাটিয়ে দেয়।

কিন্তু কোথায় বন্ধু?

স্টার্ণফেল্ড যখন এল, বেলা দশটা বাজে। বেড়াতে যাবার কথা তার আদপে মনেই ছিল না। ধীরে-সুস্থে সে এসে ঘরে ঢুকল। এডগার তাকে দেখেই দৌড়ে এল, বেড়াতে নিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দিল।

স্টার্ণফেল্ড লজ্জা পায় নিজের ভুলো মনের জন্যে, সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যায়। কিশোর বন্ধুটির হাত মুঠো করে ধরে সে পা বাড়ায়, কিন্তু হলঘরের বাইরে নয় — ঘরের মধ্যেই পায়চারী করতে থাকে। আসলে এক্ষুণি এখান থেকে চলে যাবার ইচ্ছে তার নেই। কারো জন্যে যেন প্রতীক্ষা করে — একবার এ-দরজা, একবার ও-দরজার দিকে তাকায় ঘনঘন। তাকাতে তাকাতে হঠাৎ থমকে সোজা হয়ে দাঁড়ায় — আসছেন, তিনি আসছেন!

দূর থেকেই সস্মিত মুখে শ্রীমতী নমস্কার জানালেন।

বেড়াতে যেতে তিনিও রাজি। তবে আর কি, তিনজনে তখন বেরিয়ে পড়ল।

এডগার ঠিক এটা আশা করে নি। মা-মণিটা যেন উড়ে এসে জুড়ে বসল! বড় হতাশ হয় সে। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে গুটিগুটি চলতে থাকে, মাকে দেখেই মেজাজ তার বিগড়ে গেছে। তারা দুজনে

কেমন একা-একা বেড়াত, তা না, উনি-ও আবার সঙ্গে এলেন! নেহাত দয়া করেই না সে তার বন্ধুর সঙ্গে মা'র আলাপ করিয়ে দিয়েছিল, এই নাকি তার ফল! ইশ্, তখন কে জানত যে মা-টাও এসে তার বন্ধুত্বে ভাগ বসাবে!

বন্ধুটিও যেন কেমনতরো! মা'র সাথে এক নাগাড়ে বকবক করে চলেছে! তার দিকে যদি ফিরেও তাকায়! আশ্চর্য…!

তিনজনে বনের দিকে এগোতে থাকে। কথাবার্তা যা কিছু সবই এডগারকে নিয়ে। ভদ্রমহিলা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মাতৃসুলভ উৎকণ্ঠার সাথে কেবলই এডগারের স্বাস্থ্যের কথা উল্লেখ করেন, আর এডগার যে কত ভালো এবং কিরকম ইন্‌টেলিজেণ্ট বারবার স্টার্ণফেল্ড শুধু তাই জানায়। এডগারের নাম মুখে না এনে বলে — 'বন্ধু'।

এডগার এতেই খুশি, তার মনের বিরূপতা কেটে যায়। এর আগে কোন বয়স্ক লোক তাকে এতখানি মর্যাদা দেয়নি। অথচ তার ধারণা, এটা তার সত্যিই প্রাপ্য। বড়রা তার সঙ্গে ভালো করে কথা বলে না, সে বলতে গেলেও ধমকে ওঠে — কিন্তু বন্ধু তার সম্পর্কে কেমন এক-বয়েসীর মত কথা বলে চলেছে। আগে দৈবাৎ যদি তার কোন মনের কথা ফস করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেত, কী ঠাট্টাই না করত সকলে! ছেলেমানুষী বলে হেসেই উড়িয়ে দিত! আর এখন? তার প্রত্যেকটি কথা বন্ধু কেমন গম্ভীরভাবে শোনে!

সকলেই যদি বন্ধুর মত তার সঙ্গে ব্যবহার করে তো দু'দিনেই সে বড় হয়ে উঠতে পারে — কিন্তু, কেউ কি তা করবে ছাই? করবে না — তাহলে যে বড়দের মান যায়!

জীর্ণানি বাসাংসির মত মুহূর্তে নিজের কৈশোরটাকে যেন ঝেড়ে ফেলে এডগার—বয়স্ক মানুষের মত বড় বড় পা ফেলে হাঁটতে শুরু করে বন্ধুর পাশে পাশে।

ভ্রমণ শেষে ভদ্রমহিলা স্টার্ণফেল্ডকে একসঙ্গে লাঞ্চ খাবার আমন্ত্রণ জানালেন। তাঁদের মৌখিক পরিচয় এখন বন্ধুত্বে পরিণত।
তিনজনে এখন গলায় গলায় ভাব — একটি মানুষ, একটি মানুষী আর একটি মানবকের মিলিত কলরবে আশ্চর্য এক ঐকতান সৃষ্টি হয়েছে।

চার

শিকারী ভাবছে, শিকারকে কোণঠাসা করার সুবর্ণক্ষণ সমুপস্থিত। ছেলেটা এখন অবান্তর, অবাঞ্ছিত। ওর ভূমিকা সমাপ্ত। এখন আর ওটাকে নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি! কথায় বলে 'টু ইজ কম্পানী, থ্রি ইজ নান্' — তৃতীয় একজন সামনে থাকলেই হৃদয়ের মুখে কুলুপ পড়ে, মনের কথা মুখ ফোটে না, মন-দেয়া-নেয়া ঘটে না — সময় কাটে বাজে কথায়। অথচ তার মতলব যে কি কথায়-কথায় ইঙ্গিতে-ইশারায় সেটা এখুনি জানিয়ে দেয়া দরকার — এসব ব্যাপারে বেশি দেরী করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। সবুরে সর্ব নষ্ট।

আর, আর, — ও-ও কি এতক্ষণেও তা বোঝেনি?

নিজের ওপর স্টার্ণফেল্ডের বিশ্বাস অগাধ — আরব্ধ কাজের সাফল্য সম্পর্কে সে সুনিশ্চিত। তাছাড়া সে শুনেছে, স্বামীর সঙ্গে মেয়েটির বনিবনা কম।

এর জন্যে কি মনে কোন ব্যর্থতাবোধ নেই ওর?

নিজের রূপ সম্পর্কে কি ও সচেতন নয়? যৌবন যায়-যায়, স্বামীর মুখ

চেয়েই এতকাল সাধ্বী স্ত্রী হিসেবে কাটিয়ে এল কিন্তু কি দিয়েছে স্বামী ওকে? সুন্দরী যুবতী স্ত্রীর প্রাপ্য মর্যাদা তো সে ওকে দেয়নি। এর জন্যে নিশ্চয় ওর মনে আজ এই যৌবন-সীমান্তে এসে আফসোস দেখা দিয়েছে। এইটেই স্বাভাবিক—পুরুষকে রূপমুগ্ধ দেখতে কোন্ রূপসী না চায়?

এখন ওর মনে শুধু একটি দ্বন্দ্ব — মাতৃত্ব, না নারীত্ব — সংসারে কোনটা বড়, দাম বেশী কোনটার?

ওর যা বয়েস, জীবনের রহস্য হয়ত অনেক আগেই উন্মোচিত হয়ে গেছে, আজ এক নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে, জীবনের শেষ প্রশ্ন — মনের অবদমিত কামনা চায় যৌবনের শেষ অভিজ্ঞতাটি সঞ্চয় করে নিতে।

যৌবনোত্তর জীবন তো মরা নদী। স্রোতহীন, নিস্তরঙ্গ, অগভীর।

মাতৃত্ব, না নারীত্ব — কোন্ পথ? নিজের জন্যে বাঁচবে, না বাঁচবে সন্তানের মুখ চেয়ে?

শুধু মা, না প্রিয়তমা — কোনটা আজ কাম্য ওর?

এ বড় ভীষণ দ্বন্দ্ব।

মেয়েদের মন স্টার্ণফেল্ড ভালো করেই জানে। নারী-মনস্তত্ব তার নখ-দর্পণে। সে বুঝতে পারে যে, দেখে-শুনে ঠিক জায়গাতেই টোপটা ফেলা হয়েছে। জীবনের দ্বন্দ্ব মেয়েটির সবে দেখা দিতে শুরু করেছিল, এখন তাকে খুশি মনে বেছে নিতে হবে একটি পথ — কর্তব্যের কঙ্করাকীর্ণ সড়ক, না আনন্দের কুসুমাস্তীর্ণ এ্যাভেনিউ?

স্টার্ণফেল্ড লক্ষ্য করেছে, কথাবার্তার সময় মেয়েটি স্বামীর কথা বড় একটা মুখে আনে না — নিতান্ত জৈব এবং সাংসারিক প্রয়োজনগুলি মেটান ছাড়া আর কিছু করার সাধ্য বা উৎসাহ সে-ভদ্রলোকের নেই।

মেয়েটি ভেবেছিল নামী স্বামীকে বিয়ে করলে জীবনেরও দামও তার বেড়ে যাবে — পাঁচজনের চোখে একটা কেউ-কেটা হয়ে উঠবে। সে-আশা তার শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এর চেয়েও মর্মান্তিক, ছেলেটার দিকেও স্বামী ফিরে তাকায় না।

কথা বলতে বলতে তার মুখ বিষাদে ভরে যায়, স্বর সজল হয়ে আসে। প্রস্তুতি যথেষ্ট হয়েছে, ভূমিকা সমাপ্ত — আবার কাজ শুরু করা দরকার। স্টার্ণফেল্ড মনস্থির করে ফেলে।

কিন্তু তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে না সব আবার ভেস্তে যায়! পাকা শিকারীর মত গাঁথা মাছকে প্রথমে সে জলেই খেলাতে থাকে, টানা-হেঁচড়ায় যাতে সুতো না ছেঁড়ে সেদিকে যেমন সচেতন, তেমনি আলগা পেয়ে যাতে নাগালের বাইরে না চলে যায় সেদিকেও পুরো হুঁশিয়ার। বাইরে নিস্পৃহ ভাব দেখায়, তার যেন কোন গরজই নেই। আসলে কিন্তু মেয়েটিকে হাত করার চেষ্টায় ত্রুটি রাখে না। অভিজাত বংশের যুবক সে, চেহারায় সুদর্শন, চালচলনে চৌকশ — এতেও কি ও মজবে না? ধরা দেবে না তার বাহুবন্ধনে?

নিজের ঘরে বসে থাকে স্টার্ণফেল্ড, ইচ্ছে করেই নিজেকে আড়াল করে রাখে। ভাবে, তাকে না দেখে মেয়েটা না-জানি কত ছটফট করছে! কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, তার অদর্শনে ভদ্রমহিলা মোটেই বিচলিত না — বিচলিত বরং তাঁর ছেলে।

বন্ধুর জন্যে উসখুস করতে থাকে এডগার — খেলায় মন ওঠে না পড়ায়

মন বসে না, একবার সিঁড়ির কাছে যায় একবার হলঘরে আসে — একনজর বন্ধুকে দেখার জন্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার এই ভাবে কাটে। তবে কি বন্ধুর কিছু হয়েছে, কিম্বা, না জেনে তার মনে সে দুঃখু দেয়নি তো? নিশ্চয়, হ্যাঁ, নির্ঘাৎ কিছু একটা ঘটেছে। নইলে সে এমন করবে কেন? এমন লোক তো সে নয়!

হে ভগবান! এডগারের বুকে মোচড় দিয়ে ওঠে।

বাইরে সন্ধ্যার অন্ধকার নামে, জলে ঝাপসা হয়ে আসে এডগারের দুই চোখ।

রাত্রে খাবার ঘরে স্টার্ণফেল্ড সবে পা দিয়েছে, এডগার লাফিয়ে উঠল। সকলে অবাক হয়ে তাকায়, মা চোখ কোঁচকান, এডগারের কিন্তু কোন দিকে খেয়াল নেই। ছুটে গিয়ে দুই হাতে স্টার্ণফেল্ডের গলা জড়িয়ে ধরে।

'বেশ লোক যাহক! কোথায় ছিলে এতক্ষণ? ভারি ইয়ে হয়েছে, না! সারাদিন বলে কত খুঁজেছি আমরা।'

ছেলের 'আমরা' শুনে মা'র অর্থাৎ শ্রীমতী ব্লুমেণ্টালের মুখ লাল হয়ে ওঠে।

চাপা কণ্ঠে ধমক দেন,'এই খোকা, এখানে এসো, ভদ্র হয়ে বসো বলছি।' মা'র হুকুম মাফিক এডগার এসে বসে সত্যি, কিন্তু মুখ থামায় না — প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যায়।

মা পুনশ্চ ধমক দেন, 'কি বকবক করছিস! উনি কি কারো হুকুমের

চাকর ? ওঁর যা খুশি তাই করবেন। হয়ত আমাদের সঙ্গে গল্প করতে ওঁর ভালো লাগে না, তাই —' কথা অসমাপ্ত রেখে শ্রীমতী মুখ ফেরান।

এইত! মনে মনে হাসে স্টার্ণফেল্ড, ওষুধ ধরেছে। ছেলেকে বকুনি শুধু নিছক বকুনি নয়, কেমন একটা চাপা অভিযোগের, মানে অভিমানের, সুরও যেন আছে তার মধ্যে।

এ অভিযোগ কার প্রতি ?

এ অভিমান কার ওপর ?

স্টার্ণফেল্ড নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসে। এত সহজেই সিদ্ধিলাভ ঘটবে সে আশা করেনি। খুশিতে ঝলমল করে তার মুখ, জুয়াড়ী নেশার আমেজ নামে মনে। কথা বলতে শুরু করে সপ্রতিভভাবে, সাবলীল সুরে। শক্তিশালী কথা-শিল্পীর মত অনর্গল কথা বলে যায়। এবং প্রতিপক্ষ হাঁ করে তার প্রতিটি কথা গিলছে বুঝতে পেরে ভেতরে ভেতরে আরও বেশি উৎসাহিত হয়ে ওঠে।

দেশেবিদেশে অভিজ্ঞতা এ-জীবনে সে কম সঞ্চয় করেনি, রঙ চড়িয়ে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে সেই সব রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কাহিনী বিবৃত করে চলে, অর্থাৎ ভদ্রমহিলার সামনে নিজেকে 'হিরো' করে তুলতে চায়।

শ্রীমতী বিস্মিত, মুগ্ধ, বুঝি বা রোমাঞ্চিতও। স্টার্ণফেল্ডের বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতার কণামাত্রও তাঁর ভাগ্যে জোটেনি। জীবনে তিনি কীই বা দেখেছেন! পৃথিবীর কতটুকুই বা জানেন!

এদিকে মা'র চেয়ে ছেলের অবস্থা আরও কাহিল। বহু কীর্তি-কাহিনী শুনে দুই চোখ তার ফেটে পড়তে চায়। খাওয়া-দাওয়া ভুলে হাত গুটিয়ে এডগার ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে বর মুখের দিকে।

ক্ষণে ক্ষণে শরীরে শিহরণ জাগে।

এই তার বন্ধু! এতবড় সাহসী বীরপুরুষ সে!

এই মানুষটাই একবার ভারতবর্ষে নিজে হাতে বাঘ মেরেছে? একবার দুবার নয় — অনেকবার? রোমাঞ্চকর শিকার-কাহিনী, নেটিভদের রোমহর্ষণ গল্প, গভীর জঙ্গলের ভয়াবহ নানান কাণ্ডকারখানা — এসব এডগার এতদিন শুধু বইয়ে পড়েছে, নিছক গল্প বলে মনে হয়েছে। বাস্তবেও যে এরকমটা ঘটতে পারে তার ধারণা ছিল না। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, বাস্তবেও এসব ঘটে — এবং তার এই বন্ধুর জীবনেই তো কতবার ঘটেছে।

এই লোক নিজে বাঘ মেরেছে — আবার একটা দুটো নয়, অনে-ক-গুলো? অ্যাঁ!

একটা বাঘ-মারা লোক তার সামনে জলজ্যান্ত বসে — সে আবার কিনা তার বন্ধু!

মন্ত্রমুগ্ধের মত স্টার্ণফেল্ডের মুখ থেকে চোখ সরাতে পারে না এডগার, হাজারো প্রশ্ন মনে ভিড় করে আসা সত্ত্বেও গলা দিয়ে স্বর বেরোয় না। কথা কইতে গেলেই আবেগে গলা বুজে আসে, থরথর করে সারা দেহ। সবচেয়ে তার মনে ধরেছে ভারতে বাঘ-শিকারের গা-ছমছমে কাহিনীটি। ছবিটি যেন সে স্পষ্ট দেখতে পায় চোখের সামনে। হাতীর পিঠে হাওদার ওপর বন্ধু বসে, দুপাশে সুন্দর সুন্দর সব রঙ-বেরঙের পাগড়ী-পরা অসংখ্য মানুষ। বাঘটা হাঁ করে প্রচণ্ড গর্জন করছে — চারদিকে ভীষণ জঙ্গল··· বাঘের কামড়ে হাতীটার ঘাড় থেকে রক্ত ঝরছে গলগল করে — কী ভয়ানক ব্যাপার, ভাব একবার!

শুধু এই ?
আর পোষা হাতীর কাণ্ডটা যা বলল শুনে তো তাজ্জব হয়ে যেতে হয় — পোষা হাতী নাকি বুনো হাতীদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে ফাঁদে এনে ফেলে, অ্যাঁ! কী অবাক কাণ্ড, ভাব দিকি! বিশ্বাসই যে হতে চায় না! কিন্তু বন্ধু কি আর বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে বলছে? এডগারের দুই চোখ বিস্ফারিত।
হঠাৎ মা'র কথার তার স্বপ্ন ভেঙে যায়।
'রাত হল খোকা, এবার শুতে যাও।'
মুখে কাতরতা ফুটে ওঠে এডগারের। শুতে যেতে বললে প্রত্যেক ছেলেই মনে মনে ক্ষুণ্ণ হয়। ছেলেরা বড়দের চেয়ে ছোট কিনা, তাই তাদের বেশী করে ঘুমনো দরকার — এটাই যেন পাঁচজনকে চিৎকার করে জানিয়ে দেবার জন্যে বলা — শুতে যাও। কি অপমান, কী লজ্জা! তাছাড়া, এই রকম এক উত্তেজক পরিস্থিতিতে মার 'শুতে যাও' শুনে ক্ষোভে দুঃখে লজ্জায় অপমানে এডগারের মন একেবারে বিষিয়ে যায়।
'লক্ষ্মী মা-মণি, আর একটা হাতীর গপ্প শুনেই'—
'ছি, অবাধ্য হয়ো না', কথার মাঝখানেই মা বাধা দেন, 'রাত হয়ে গেছে, তুমি গিয়ে শুয়ে পড়। কাল বরং আমার মুখে বাকিটা শুনো — আমি ওঁর কাছ থেকে এখন শুনে রাখছি।' গম্ভীর স্বরে মা বলেন।
খানিকটা অবাক হয় এডগার। অন্য দিন মা-ও তার সঙ্গে শুতে যায়। কিন্তু আজ —।
যাকগে! তাই বলে বন্ধুর সামনে তো আর মা'র পায়ে ধরে খোশামুদি

৩

করা চলে না! মা যখন একবার হুকুম করেছে, কিছুতেই তার আর নড়চড় হবে না।

'বেশ, তাহলে আমার ছুঁয়ে বল, স-ব কথা আমায় বলবে, কিছু ভুলে যাবে না — বল? হাতীর গপ্পটা —'

'বলবরে-বলব — বাব্‌বা!'

'আজ রাত্তিরেই শুতে এসে বলবে বল?'

'বললাম তো বলব। এখন যা শিগগীর।'

বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিতে গিয়ে কান্না পায় এডগারের।

পাঁচ

স্টার্ণফেল্ডের সঙ্গে আরও খানিকটা সময় গল্প করে কাটাবার জন্যে শ্রীমতী ব্লুমেণ্টাল থেকে গেলেন। কিন্তু হাতী বা শিকার-কাহিনী আর জমে না। এডগার দরজার আড়ালে যাওয়া মাত্র দুজনেই কেমন বিব্রত বোধ করে, কথা খুঁজে পায় না,—কথা খুঁজে পায় তো বারেবারে খেই হারিয়ে ফেলে কথার।

স্টার্ণফেল্ড বলল, 'চলুন না লাউঞ্জে যাওয়া যাক।'

শ্রীমতী কথা না বলে উঠে দাঁড়ালেন।

লাউঞ্জে একটা নিরিবিলি কোণ দেখে দুজনে বসে। স্টার্ণফেল্ড শ্যাম্পেনের অর্ডার দেয়। তারপর শ্যাম্পেনের গেলাসে দুয়েক চুমুক দিতেই বিব্রত ভাবটা আস্তে আস্তে কেটে যায়, গল্পগুজবে মত্ত হয়ে ওঠে দুজনে।

স্টার্ণফেল্ড সুদর্শন, তবে কন্দর্পকান্তি নয়। আসলে তার জোয়ান স্বাস্থ্য, যৌবন-দীপ্ত মুখাবয়ব, আর মানানসই স্মার্টনেসই মেয়েদের মন কাড়ে। শ্রীমতীও এতেই মজলেন। লোকটাকে দেখে এখন আর অজানা

আতঙ্কে তাকে এড়িয়ে চলার ইচ্ছে জাগছে না, বরং এর সঙ্গটাকে মোটামুটি মিষ্টিমধুর বলেই মনে হচ্ছে।

কথায় কথায় স্টার্ণফেল্ড মাত্রা ছাড়ায়। ভদ্রমহিলার বুক দুলে ওঠে, রক্তে বাসনার জোয়ার জাগে, ঝাঁ-ঝাঁ করতে থাকে দুই কান।

অস্বস্তিতে তিনি নড়ে-চড়ে বসেন, লোকটা যেন কথার শরীর দিয়ে তাঁর দেহ-বল্লরী জড়িয়ে ধরতে চাইছে।

হঠাৎ চেয়ারে চিৎ হয়ে পড়ে সশব্দে শিশুয়ালি হাসি হেসে ওঠে স্টার্ণফেল্ড, শ্রীমতী এতক্ষণে স্বস্তির শ্বাস ছাড়েন।

মুখে যাই বলুক সবই ওর মুখের কথা, শ্রীমতী ভাবেন — নিছক মুখের কথা শুনে কি বুক কারো দুলে ওঠে, না রক্তে বাসনার জোয়ার জাগে ? কানের ওই ঝাঁ-ঝাঁ করাটাও নেহাৎ অহেতুক। ঘন ঘন তিনি নিশ্বাস ফেলেন।

একেকবার আবার ভাবেন, একটু সাবধান করে দেবেন নাকি লোকটাকে ? কী সব আজেবাজে বকছে — তাঁকে এ সব শোনাবার মানে ? কিন্তু কুণ্ঠা জাগে।

কুণ্ঠাটা কাটিয়ে উঠলে দেখা যায়, মনই নারাজ। পুরুষের প্রশস্তি শুনতে ভালো না লাগে কোন মেয়ের ? এতে লজ্জার কি আছে ? মুখ ফুটে তাই সাবধান করা আর হয়ে ওঠে না, তার বদলে ব্যাকুল দুই চোখ তুলে শ্রীমতী তাকিয়ে থাকেন সমর্থ-জোয়ান মানুষটির মুখের দিকে।

অর্থাৎ তিনি মজেছেন, শিকারীর ফাঁদে পা দিয়েছেন। ক্রমে নিজেও উৎসাহিত হতে থাকেন, ভিতরে ভিতরে কিসের একটা জোরাল তাগিদে ছটফটান। স্টার্ণফেল্ডের কথার জবাব দেন চটপট, প্রশ্নের পিঠে প্রশ্ন

হানেন ঘনঘন, নতুন উৎসাহে নতুনতর উদ্দীপনায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠেন। একটু একটু করে লোকটা একেবারে ঘেঁষে আসছে — আসুক না, সাধারণ গা-ঘেঁষে আসায় কি যায় আসে ? বরং ওর উষ্ণ নিশ্বাস নিজের উলঙ্গ কাঁধের ওপর অনুভব করতে ভালোই লাগছে এখন।

নিজেদের নিয়ে দুজনে এমন তন্ময় হয়ে পড়ে যে সময়ের হুঁশ থাকে না। হঠাৎ মাঝরাত্তিরের ঘণ্টা বাজতে শ্রীমতী সচেতন হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ব্যাপারটা যে কতদূর গড়িয়েছে, সমর্থ-জোয়ান মানুষটার সাহস যে কি করে এতখানি বেড়ে গেল — তিনি ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না।

আগুণ নিয়ে খেলা জীবনে এই তিনি প্রথম করছেন না। কিন্তু এতখানি অগ্রসর কোনদিন হননি, কাউকে হতেও দেননি।

আজ একি হল তাঁর, নিজের ওপর নিজের কোন হাতই যেন নেই আর ! কি যেন হারাচ্ছেন, অথচ প্রতিবাদ করতে পারছেন না—সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন, মাথা ঝিমঝিম, পায়ের তলায় পৃথিবী টলমল — কিন্তু কেন ?

কেন !

এসব কি মদের নেশায় ? শুধুই নেশায়, না, কোন দুর্বোধ্য উত্তেজনায় ! 'আজ আসি,' জড়িত কণ্ঠে কোনমতে শ্রীমতী উচ্চারণ করেন, 'কাল আবার দেখা হবে।'

বিদায় নেবার জন্য তিনি হাত বাড়িয়ে দেন, কিন্তু এত সহজে তাঁকে বিদায় দেবার ইচ্ছে বোধ হয় প্রতিপক্ষের নেই। স্টার্ণফেল্ড তাঁর করতল মুঠো করে চেপে ধরল, চুম্বন করবার জন্যে কায়দাদুরস্ত ভঙ্গিতে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু শুধু চাঁপার কলির মত আঙুলগুলিতে চুমু দিয়েই সে থামে না মণিবন্ধেও মুখ ঘষতে থাকে।

তার ছাঁটা-ছাঁটা গোঁফের খোঁচায় চাপা একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহ শ্রীমতীর হাত থেকে উঠে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। একই সঙ্গে বিরাগ-অনুরাগের জোরালো এক অর্কেস্ট্রা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে স্নায়ুতে স্নায়ুতে। রক্তে আবার বাসনার জোয়ার ফুঁসে ওঠে, ঢিপঢিপ করে বুক, কেমন এক উৎকণ্ঠায় ভরে যায় মন। হঠাৎ তিনি হাতটা ছিনিয়ে নেন।

'আর একটু থাকুন, প্লিজ !'

কিন্তু শ্রীমতী ততক্ষণে দরজার কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন, মাতালের মত টলতে টলতে এগুচ্ছেন।

সেই দিকে তাকিয়ে ঠোঁটে হাসি ফোটে স্টার্ণফেল্ডের। ওষুধ ধরেছে, এই তো তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। মনস্কামনা পূর্ণ তার।

ওদিকে শ্রীমতীর মনে জেগে উঠেছে দুটি নারী — একজন চায় যত শিগ্‌গীর সম্ভব স্টার্ণফেল্ডের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে। তার ভয়, এই বুঝি লোকটা তার ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে !

আরেকটি নারীর আফসোস — হায়রে, ঝাঁপিয়েই যদি পড়ত !

দাম্পত্য প্রেমের দৈনন্দিন একঘেয়েমি থেকে কতদিন তো মুক্তির জন্য তিনি ব্যাকুল প্রার্থনা জানিয়েছেন, প্রেমের নিত্য-নতুন বিচিত্র থেকে বিচিত্রতর অভিজ্ঞতায় জীবন ভরে তুলতে চেয়েছেন — বহু-প্রত্যাশিত সেই পরম ক্ষণটি আজ বুঝি ধরা দিয়েছিল।

এর আগেও যে সুযোগ না এসেছে তা নয়, কিন্তু কি এক আতঙ্কে প্রথমেই তিনি সরে দাঁড়িয়েছেন।

দাঁড়িয়েছেন, কিন্তু মন তৃপ্তি পায়নি। শুধু কথায় মন তৃপ্তি পায় না। রক্ত-মাংসের জীবন্ত অনুভূতি চায়, দুকূলপ্লাবী বন্যায় নিজেকে ভাসিয়ে দিতে চায় তাঁর মন।

কিন্তু স্টার্ণফেল্ড হল গিয়ে পাকা শিকারী। প্রথম প্রথম সুযোগ পেয়েও ছেড়ে দেয়াই পাকা শিকারীর সবচেয়ে বড় লক্ষণ। জয় যখন অবধারিত, প্রতিপক্ষের মুহূর্তের দুর্বলতার সুযোগ তখন নেবে কেন — বিশেষত মদের নেশায় ওর মন যখন বিভ্রান্ত এখন? এটা অন্যায়, তারই দুর্বলতার পরিচয়।

এর দরকারই বা কি? সুস্থ মাথায় ভেবে-চিন্তে ও নিজে এসে ধরা দিক — তবেই না তার জয়ের গৌরব।

ধরা ও দেবেই। শুধু মদের নেশা নয়, আরেক নেশায় ওর দেহ-মন এমন মাতাল হয়ে উঠবে যে ধরা না দিয়ে উপায় থাকবে না। মদের নেশা এক সময় কেটে যাবে, কিন্তু সে নেশা চড়বে ক্রমে ক্রমে। কস্তুরীমৃগের মত ও উদ্ব্যস্ত হয়ে উঠবে তখন, স্বেচ্ছায় এসে ধরা দেবে, বাঁধা পড়বে।

ওপরের সিঁড়িতে পা দিয়ে ভদ্রমহিলা দুহাতে বুক চেপে ধরেন। উত্তেজনায় বুক বুঝি চৌচির হয়ে যাবে!

গভীর এক দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন। এই দীর্ঘ শ্বাস ভয়ানক এক বিপদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে, কিন্তু আবার সেই জন্যেই শুধু নয় — কেন মুক্তি পেলেন, কে চেয়েছিলে এই মুক্তি — মনের গোপন হাহাকার দীর্ঘশ্বাস হয়ে বেরিয়ে আসে। মেঝের ওপর চোখ রেখে কোন মতে দেয়াল ধরে টলতে টলতে তিনি ঘরের দিকে এগিয়ে

যান। দরজার ঠাণ্ডা হাতলে হাত রেখে আরেকবার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন·········যাক, এতক্ষণে নিশ্চিন্ত!

ছেলের ঘুম যাতে না ভাঙে সেই জন্যে পা টিপে টিপে ভদ্রমহিলা ঘরে ঢুকে দরজায় খিল তুলে দিলেন।

কিন্তু মুখ ফিরিয়েই আতঙ্কে তিনি থমকে দাঁড়ান।

ও কি! অন্ধকারের মধ্যেও কিসের একজোড়া চোখ অমন জ্বলছে দপদপ করে?

তাড়াতাড়ি সুইচ টিপে আলো জ্বালিয়ে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিলেন, ও পাশ থেকে নিদ্রাজড়িত স্বরে প্রশ্ন আসে —

'মা-মণি! তুমি?'

'এত রাত্তিরেও তোর চোখে ঘুম নেই, হতভাগা।' আলো নিভিয়ে দিয়ে মা ধমকে ওঠেন।

এডগার এতক্ষণ আধশোয়া অবস্থায় কাৎ হয়ে ছিল, মা'কে কাছে আসতে দেখে উঠে বসে।

মা প্রথমে ভাবলেন, ছেলের বুঝি আবার জ্বর আসছে। তাই নিজের ঘর ছেড়ে তাঁর বিছানায় এসে শুয়ে আছে। এতক্ষণ ধরে হয়ত তাঁরই প্রতীক্ষা করছে।

ঘুম-ঘুম চোখে এডগার বলে, 'তোমার জন্যে বলে আমি কখন থেকে বসে আছি। আর তুমি কিনা এতক্ষণে এলে!'

'কি চাস?'

'বাঃ, ভুলে গেলে? সেই হাতীর গপ্প?'

'হাতী? কিসের হাতী?' বলতে বলতে প্রতিশ্রুতির কথা তাঁর

মনেপড়ে যায়। বেচারা! হাতীর গল্প শোনবার জন্যে এত রাত্তির অবধি জেগে আছে — দ্যাখো কাণ্ড! বোকা কি আর গাছে ফলে!

হঠাৎ মা'র রাগ হয়ে যায়। কিন্তু এ রাগ নিজেরই ওপর — কেমন একটা লজ্জা ও অপরাধবোধের গ্লানিতে মনটা মুহূর্তে তিক্ত হয়ে ওঠে।

'যা, শিগগীর নিজের বিছানায় শো গিয়ে। বদমাস কোথাকার! গেলি —।'

একেবারে বেকুব বনে যায় এডগার। ব্যাপার কি? কি এমন অন্যায় সে করল যে মা এমন করে বকছে? ফ্যাল ফ্যাল করে সে তাকিয়ে থাকে।

ছেলের বোকা-বোকা চাউনি দেখে মা আরও ক্ষেপে যান, 'কি, কথা কানে যায় না? গেলি তোর নিজের ঘরে?' অন্যায় করছেন বুঝতে পেরেও তিনি নিজেকে সংযত রাখতে পারেন না।

একটি কথাও আর না বলে ছলছল চোখে এডগার ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। ঘুমে শরীর আর বইছে না, কিন্তু তার চেয়েও বড় দুঃখ মা-মণি কথা দিয়ে কথা রাখল না, বরং কেন জানি তার ওপর ভীষণ রাগ করেছে। কিন্তু কেন, কি তোর দোষ?

ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে এডগার। ঘুম সে চায় না, প্রাণপণে জেগে থাকবার চেষ্টা করে, তবু কে যেন তাকে জোর করে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। ঘুমে একেবারে অচেতন হয়ে পড়ার আগের

মুহূর্ত পর্যন্ত মনে মনে আফসোস করে, নিজের ওপর অকথ্য রাগ হতে থাকে — একি ছেলেমানুষের মত খালি ঘুম পায় তার! ছি ছি ছি! কাল সকাল থেকে নিজের বয়েসটাকে বড়ই লজ্জাকর বলে মনে হচ্ছে এডগারের।

কেন এত কম বয়েস তার!

ছয়

স্টার্ণফেল্ডেরও সে রাত্রে ভাল করে ঘুম হল না।

হাতে পেয়েও মেয়েটিকে ছেড়ে দেবার অস্বস্তিতে রাতভোর সে ছটফট করে। স্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙে বারবার আর রাগ হয় নিজের উপর — সুযোগের সুব্যবহার না করা কি বোকামিটাই যে হয়েছে!

পরের দিন সকালে সে যখন চা খেতে নামল তখন পর্যন্ত রাতের আফসোসটা তার বুকে কাঁটার মত বিঁধছে।

কোথায় যেন ছিল এডগার, বন্ধুকে দেখতে পেয়েই ছুটে আসে। শীর্ণ দুবাহু দিয়ে বন্ধুর দুই হাত জড়িয়ে ধরে। মা আসেনি এখনও আসুক না মা, কিছুতেই তাকে আর বন্ধুর কাছে ঘেঁষতে দেবে না— এ তার একার বন্ধু, একেবারে তার একার। মা কাল কথা রাখেনি, তারই বন্ধুর কাছ থেকে কত সব মজার মজার গল্প শুনল—অথচ একটাও তাকে বলল না। আজ সে নিজে বন্ধুর মুখ থেকে গল্প শুনবে, আসুক না মা একবার, বন্ধুকে নিয়েই তাহলে

সে দূরে চলে যাবে না—ইয়ার্কি! কি বলো। অ্যাঁ? মুখে প্রশ্নের স্রোত বইয়ে দেয় এডগার।

বিরক্ত স্টার্ণফেল্ড। আচ্ছা নাছোড়বান্দার পাল্লায় পড়েছে, আঠার মত সব সময় পেছনে লেগেই আছে। ছেলেটার 'বন্ধুত্ব' বোঝা বলে এখন মনে হয়। সব সময় বারো বছরের একটা ছোঁড়াকে নিয়ে ট্যাঙস ট্যাঙস করার চেয়ে ঝকমারী আর কি আছে! গত রাতের জের মেটবার আগে শ্রীমতীকে একটু নিরিবিলি পাওয়া দরকার — কিন্তু এই বিচ্ছুটার হাত এড়াতে না পারলে কি করে তা সম্ভব?

বিচ্ছিরি লাগে স্টার্ণফেল্ডের। আসলে ছেলেটাকে প্রথম দিকে অত লাই দেয়াই তার ভুল হয়েছে। বন্ধু — বন্ধুর নিকুচি করেছে! ছোট ছেলেদের ভাবালুতাকে একবার উস্কে দিলে তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া কী দুষ্কর!

কিন্তু দশটার আগে যখন ওঁর আগমন ঘটছে না তখন এই সময়টা না হয় তাঁর আত্মজকে নিয়েই কাটান যাক — শেষ পর্যন্ত চারদিক ভেবে-চিন্তে স্টার্ণফেল্ড স্থির করে। হুঁ-হাঁ করে ছেলেটার কথার জবাব দিয়ে যায়।

যেভাবে প্রশ্নের পিঠে প্রশ্ন করছে এডগার, বিশদ জবাব শোনার ধৈর্যও তার নেই। স্টার্ণফেল্ডের হুঁ-হাঁতেই সে কৃতার্থ।

হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে স্টার্ণফেল্ডের যেন মহা জরুরী একটা কথা মনে পড়ে গেল।

তার না এক মাসতুতো ভাইয়ের আসবার কথা আছে আজ সকালে?

একটা খবর তো নেয়া দরকার। পারবে এডি খবরটা আনতে? পারবে? আচ্ছা দেখাই যাক, কেমন পারে।
এডগারকে সে সামনের হোটেল থেকে ভাইয়ের খোঁজ আনতে পাঠিয়ে দেয়। ভাইয়ের নামটাও জানিয়ে দেয়।
বন্ধু তাকে কাজের কথা বলেছে — জীবন ধন্য তার!
ঘরের সকলকে অবাক করে দিয়ে তিন লাফে উধাও এডগার। সে যে কত বড় কাজের ছেলে — উঁহুঁ মানুষ — বন্ধুকে সেটা বুঝিয়ে দেবার জন্যে পথ দিয়ে সে ছুটতে লাগল ঊর্ধ্বশ্বাসে।

সামনের হোটেলে গিয়ে শুনল, আজ সকালে কেউ-ই আসেনি, এবং এডগার যে নাম বলছে সে নামের কোন লোকের দূর-ভবিষ্যতেও আসবার কথা আছে বলে হোটেলের কর্তারা জানেন না। ইঞ্জিনের মত সিটি দিতে দিতে এডগার ফিরে এল।
কিন্তু কই, কোথায় তার বন্ধু? এডগার এদিক ওদিক তাকায়, চারিদিকে খোঁজে, কোথাও নেই স্টার্ণফেল্ড। তার ঘরের দরজায় ধাক্কা দিয়েও কোন সাড়া মেলে না।
হলঘর থেকে খাবারঘরে, সেখান থেকে বারান্দায়, ওপরে-নীচে আঁতিপাতি করে সারা হোটেল খুঁজল — বন্ধু বেপাত্তা।
প্রত্যেকটি বয়-বেয়ারাকে জিজ্ঞেস করল — কেউ দেখেনি স্টার্ণফেল্ডকে। অবশেষে হদিশ পাওয়া গেল দারোয়ানের কাছ থেকে, একটু আগেই দুজনে বেরিয়ে গেছে — তার বন্ধু আর তার মা!

থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল এডগার। বেরিয়ে গেছে? বন্ধু আর মা? তাকে ফেলে ওরা বেরিয়ে গেল?

ধৈর্য ধরে সে ওদের প্রতীক্ষা করে। তার কিশোর সরল মনে কোনো সন্দেহ জাগে না। হয়ত ধারে-কাছে গেছে কোথাও, এখ্খুনি ফিরবে। কে জানে, হয়তো ভাইয়ের খোঁজেই গেছে বন্ধু।

মিনিটের পর মিনিট, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায় — কারো দেখা নেই। এডগার ক্রমেই অধৈর্য হয়ে ওঠে। কাল সকালে একটি বয়স্ক লোককে জীবনের সবসেরা বন্ধু হিসেবে পাবার পর থেকে তার মনে অনাস্বাদিত-পূর্ব এক উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছে।

ছেলেদের মন কিনা নরম মাটির মত, তাই প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতার ছাপ তাতে হুবহু পড়ে — সব কিছুকে তারা গভীর ভাবে একান্ত করে দেখে, গ্রহণ করে।

এবং এডগারও তার ব্যতিক্রম নয়। অভিমানে তার ঠোঁট কাঁপতে থাকে, চোখ ঝাপসা হয়ে আসে — তবু সে প্রতীক্ষা করে।

গাল দিয়ে জলের ধারা নেমে আসে — তবু এডগার অবিচল দাঁড়িয়ে থাকে। প্রতীক্ষা করে।

এততেও তার মনে কোন সন্দেহের উদ্রেক হয় না। নতুন-পাওয়া বন্ধুটিকে এমন গভীরভাবে সে ভালোবেসে ফেলেছে যে তাকে অবিশ্বাস করতে পারে না, মনই চায় না। হয়ত দোষ তার নিজের, কিম্বা কোথাও একটা ভুলচুক হয়ে গেছে নিশ্চয়।

অনেকক্ষণ পরে দুজনকে দেখা গেল।

এমন ভাবে নিজেদের মধ্যে কথা কইতে কইতে তারা ঘরে এসে ঢুকল যেন কোথাও কিছু হয়নি — এডগারকে সঙ্গে না নেবার জন্যে যেন কারো মনে কোন দুঃখই নেই!

ভাই সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস না করেই স্টার্ণফেল্ড বলে, 'আমরা ভেবেছিলাম কি পথেই তোমার সাথে দেখা হয়ে যাবে এডি।'

এরা তা হলে খোঁজ তার করেছিল?

এডগারের মনের মধ্যে সব যেন কেমন গুলিয়ে যায়।

কিন্তু, সে তো ওই সামনের বড় রাস্তা দিয়েই গিয়েছে এবং এসেওছে। ওরা তা হলে কোনদিক দিয়ে গিয়েছিল?

ছেলের প্রশ্নে মা বাধা দেন, 'ফের এডি! এত খোঁজে তোমার দরকারটা কি শুনি? বড়দের সব কথায় না থাকলে বুঝি চলে না।'

অপমানে এডগারের মুখ নীল হয়ে ওঠে। মা এই দ্বিতীয় বার বন্ধুর সামনে তাকে অপমান করল। কিন্তু কেন — কি করেছে সে? ছেলে-মানুষ ছেলেমানুষ বলে কেন তাকে বারবার এই খোঁটা দেওয়া? সত্যিই কি সে আর ছেলেমানুষটি আছে? বললেই হল!

আসলে তার বন্ধুকে দেখে খুব হিংসে হয়েছে কিনা তাই তাকে ভাগিয়ে নেয়ার মতলব করা হয়েছে। ছি ছি — কী হিংসুটে মন বাব্‌বা! তাইত বলি কি ব্যাপার। আসলে মা-ই বন্ধুকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে অন্য পথ দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল — সেই জন্যেই না বন্ধু তাকে পথে দেখতে পায়নি।

কিন্তু উঁহুঁ, কিছুতে-ই সে তার বন্ধুকে বেহাত হতে দেবে না। দাঁড়াও না, মাকে এডি ত্থাখাচ্ছে মজা! খাবার সময় মা-মণিটার সঙ্গে একটি

কথা যদি সে বলে, খালি বন্ধুর সঙ্গে কথা কইবে, সব কথা বন্ধুকেই বলে ফেলবে। বেশ হবে তা হলে!

কিন্তু মতলবটা যত সহজে মাথায় এল, কাজে পরিণত করা তত সহজ হল না।

বরং গোপন আশঙ্কাটাই তার সত্যি হয় — মা দূরের কথা, বন্ধু পর্যন্ত ফিরে তাকায় না। কাল সে-ই দুজনের আলাপ করিয়ে দিয়েছিল, আর আজ যে সে-ও পাশেই বসে আছে, কারো যদি সেদিকে খেয়াল থাকে!

দুজনে নিজেদের মধ্যেই কথা বলে, হাসি-ঠাট্টা করে। আর ক্ষোভে, দুঃখে, অভিমানে গলা বুজে আসে এডগারের।

চোখের সামনে মা তার সবচেয়ে বড় সম্পদ নতুন-পাওয়া বন্ধুটিকে চুরি করে নিচ্ছে, অথচ কিছুই সে করতে পারছে না!

একেকবার ইচ্ছে হয়, উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলের ওপর প্রচণ্ড এক ঘুঁসি মেরে জানিয়ে দেয় — এ্যাই, আমি কিন্তু আছি, পাশেই বসে আছি আমি, সাবধান! সাবধান মা-মণি, হুঁশিয়ার! কিন্তু, কিন্তু সাহস যে ছাই হয় না!

অগত্যা কি আর করা, কাঁটা-চামচ নামিয়ে রেখে হাত গুটিয়ে সে বসে রইল — খাবে না। উঁহু, কিছু-তে-ই খাবে না।

কিন্তু এতেও কোন ফল হয় না। কেউ তার দিকে তাকায়ই না তো রাগ করে মুখ ভার করে থেকে কি লাভ!

খাওয়া দাওয়া শেষ হয়ে গেলে মা'র নজরে পড়ে।

'কিরে, শরীর খারাপ লাগছে নাকি?'

'ক্ষিদে নেই।' ঝটপট জবাব দেয় এডগার। ভারী এক কথা! খেছে — শরীর-খারাপ শরীর-খারাপ! শরীর খারাপ ছাড়া আর যেন কিছু হয় না মানুষের!

ক্ষিদে নেই শুনেও মা আর প্রশ্ন করেন না। মুখ ফিরিয়ে ফের যথাপূর্ব বিশ্রম্ভালাপে মত্ত হয়ে পড়েন। আর, বন্ধুর আক্কেলটাও ছাখো — সে-ও যেন তার কথা এক্কেবারে ভুলে গেছে। কই, ক্ষিদে নেই শুনে ও-ও তো কিছু বলল না! সব সমান! এডগারের চোখ আবার জলে ভরে আসে।

ছেলেমানুষ সে হতে চায় না, কিন্তু কান্না পেলে কি আর করা — ছেলেমানুষের মতই টেবিলের ঢাকনাটা দিয়ে চোখ মুছে নেয়।

কোথায় যেন বেড়াতে যাবার কথা বলেছে মা। তার মানে, বন্ধুকে কিছুতেই তার সঙ্গে একলাটি থাকতে দেবে না। বেশ, সে-ও দেখে নেবে!

এডগার উঠে পড়ল।

দরজার কাছে গেছে, পেছন থেকে মা বললেন, 'তুমি যে লেখাপড়ার পাট একেবারে তুলেই দিলে! ইস্কুল বন্ধ বলে কি পড়াশোনাও বন্ধ নাকি! আজ সারা দুপুর ঘরে বসে হোমটাস্ক করবি, বুঝলি?'

আবার অপমান! সে যে এখনো ছেলেমানুষ, ইস্কুলে পড়ে — বারবার এই কথাটা বন্ধুর সামনে বলে কী আনন্দ মা পায়!

অসহ্য রাগে দাঁতে দাঁত চেপে ঘুরে দাঁড়ায় এডগার।

'ও, এতে বুঝি ছেলের অপমান হল!' বিদ্রূপের হাসি ফুটে ওঠে মা'র

মুখে। স্টার্ণফেল্ডের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'আচ্ছা, আপনিই বলুন, ওকে পড়তে বসার কথা বলে কী অন্যায়টা আমি করেছি?'

'পড়াশোনা না করলে কি চলে এডি — যত বেশী পড়বে ততই তো ভালো।'

তীরের মত স্টার্ণফেল্ডের জবাবটা এডগারের বুকে এসে বেঁধে। নির্ঘাৎ দুজনে মিলে কোন ষড়যন্ত্র পাকিয়েছে — তাকে ফাঁকি দিয়ে নিজেরা একা একা বেড়াতে যাবার মতলব — নির্ঘাৎ।

আমতা আমতা করে এডগার, 'বাঃ-রে, বাবা তো এখানে এসে আমায় পড়তে মানা করেছে। কেন, বাবা বলেনি, আমি যেন খুব মোটাসোটা হয়ে এখান থেকে ফিরে যাই? বেশি পড়াশোনা করলে বুঝি মোটা হয় মানুষ?'

ছেলের কথার ধরণে, বিশেষ তার বাপের উল্লেখে, ভদ্রমহিলা চুপ করে যান। টেবিলে আঙুলের টোকা দিতে দিতে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

তিন জনের মধ্যে নেমে আসে এক অস্বস্তিকর নীরবতা।

খানিক পরে মুখে জোর করে হাসি টেনে এনে স্টার্ণফেল্ড বলে, 'তোমার যা মন চায়, তাই করো এডি। তবে কি জানো, তোমার বয়েসে আমি লেখাপড়ায় তোমার মতই বেজায় ফাঁকি দিতাম, ফলে প্রত্যেক একজামিনে — ফেলটুস! সে যে কী লজ্জা আর অপমান!'

এডগারের মন বিগড়ে গেছে, বন্ধুর কথার জবাব দিতেও প্রবৃত্তি হয় না। চোখ কুঁচকে বন্ধুর মুখের দিকে তাকায় সে। অ্যাঁ, বল দেখি আসল মতলবটা কি তোমাদের? একথা আমায় শোনাবার মানেটা কি?

এর মধ্যে কোথাও কিছু একটা নিশ্চয় ঘটে গেছে — তাই এখন সব কিছু নতুন নতুন মনে হচ্ছে। কালই তারা দুজনে কেমন প্রাণের বন্ধু হয়ে উঠেছিল, আজ এখন কত পর পর মনে হচ্ছে। কেন?

কিশোর মন এ-রহস্যের কিনারা করতে হিমশিম খেয়ে যায়। বুক দুরদুর করে, চোখ নেমে আসে। মনে সন্দেহ ফণা তোলে।

'যাও, এখন গিয়ে ঘণ্টাখানেক চুপচাপ শুয়ে থাক। পরে আমাদের সঙ্গে বেরিও।'

মা-ই শেষ পর্যন্ত হার মানেন।

সাত

তিনজনে বেড়াতে বেরোল।

আচ্ছা, ব্যাপারটা কি? কেন ওরা আমার সঙ্গে আর আগের মত ব্যবহার করছে না?···গাড়িতে যেতে যেতে এডগার ভাবে, মা পর্যন্ত আমায় এড়িয়ে চলতে চায় কেন? বন্ধু যেন সব সময় আমায় কেবল ঠাট্টা করবার তাল খোঁজে! আমি কি ওর ঠাট্টার পাত্র? আমি হলুম গিয়ে ওর বন্ধু। তবে কেন আমার সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করে না?

হুঁ, দুজনেই কেমন যেন বদলে গেছে। আগেকার সে মা-ও নেই বন্ধুও আর নেই।

মা-মণির গাল দুটো সব সময় অত লাল দ্যাখায় কেন? নিশ্চয় গালে রঙ্ মাখে। হুঁ, নির্ঘাৎ। কিন্তু কই, আগে তো মাখত না?

আর, মা-মণির সঙ্গে বন্ধুর ব্যবহারটাও যেন কেমন-কেমন — সব সময় গুজগুজ-ফুসফুস, মনে হয়, দুজনেই যেন কি একটা কুকাজ করে চলেছে। হু, নির্ঘাৎ।

তাই খালি পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। লোকজন দেখে তাই অত লজ্জা, তা-ই কি যেন একটা সবসময় লুকোতে চায় — হুঁ, নির্ঘাৎ, — আমি ঠি-ক ধরেছি। তাই না ওরা সবার সামনে মন খুলে কথা কইতে পারে না, চেঁচিয়ে হাসতে পারে না। কিছু একটা ব্যাপার আছে এর মধ্যে, আমার কাছে চেপে যাচ্ছে। কিন্তু আমি — আমায় তো বাবা চেনে না — ঠি-ক বের করে ফেলব। হুঁ, নির্ঘাৎ।

অবিশ্যি একেবারে যে কিছু বুঝিনি তা নয়। অনেক বই ছোটদের পড়তে নেই — কেন নেই? সিনেমায় ব্যাটাছেলে মেয়েছেলেকে জড়িয়ে ধরলে, ছোটদের দেখতে নেই — কেন মশাই? আমি বুঝি কিছু বুঝি না, না? সেই যে আমাদের বাড়িতে এক দিদিমণি ছিলেন, আমাকে পড়াতেন, কত যত্নআত্তি করতেন — কেন তাঁকে ছাড়িয়ে দেয়া হল? আমি বুঝি জানি না? বাবাকে জড়িয়ে ধরতে দেয়নি বলেই তো। এগুলো সব এক ধরণের ব্যাপার — হুঁ, নির্ঘাৎ। কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি?

মা-মণি আর বন্ধুর ভেতরেও এই রকম একটা ব্যাপার আছে — কিন্তু, ইস্‌, ব্যাপারটার হদিশ যদি একবার পেতুম! তাহলে আমি কি আর ছেলেমানুষটি থাকতুম? মোটেই না — হুট করে বড় হয়ে যেতুম — কত মজার মজার কাণ্ড-কারখানা তাহলে জানা হয়ে যেত!... কিন্তু, উঁহুঁ, আমিও ছাড়ছি না বাবা — আমি জানবই-জানব কি গোপন ব্যাপার আছে এর মধ্যে।

বুড়ো মানুষের মত চোখ-মুখের ভঙ্গি করে এডগার বসে থাকে। মনে মনে বিড় বিড় করে, নানান চিন্তা পাক খায় মাথার মধ্যে, জীবনের

রোমাঞ্চকর এক রহস্য জানবার জন্যে ছটফট করতে থাকে একটি কিশোর হৃদয়।

সামনের দিকে চোখ পড়ে, গদীতে আরাম করে দুজনে ঠেস দিয়ে আছে। এদের একজন যে তার মা আর একজন বন্ধু — খেয়াল থাকে না। নির্নিমেষ তাকিয়ে দেখে, শুধু চোখের চাউনিতেই যেন রোমাঞ্চকর সেই রহস্যটি উদ্ঘাটিত করতে চায়।

ক্রমে ক্রমে তার ধারণা হয়, রহস্যটা সে যেন এবার একটু একটু ধরতে পারছে, শুধু মুখের দিকে তাকিয়েই ওদের মনের গোপন কথাটি যেন বুঝে নিয়েছে — কিন্তু এখনো ঠিক স্পষ্ট-পরিষ্কার হয়ে ওঠেনি এই যা। আর একটু চেষ্টা করলেই সব কিছু খোস-খোলসা হয়ে যাবে।

গম্ভীর হয়ে সে ভাবতে থাকে, বড় ভার-ভারিক্কি দেখায় তাকে। মনে মনে কৈশোরের সীমান্ত পেরিয়ে যায় — যৌবনের সিংহদ্বারে গিয়ে পৌঁছোয়।

ওদিকে কপোত-কপোতীও সুস্থির থাকতে পারে না — বকবকম বন্ধ ক'রে যায় নাকি সুস্থির থাকা?

গাড়িটাকে হঠাৎ তিন জনের পক্ষে বড় বেশি ছোট বলে মনে হয়।

জটিল জিজ্ঞাসায় দীর্ঘায়ত একজোড়া কিশোর চোখের সামনে অকথ্য অস্বস্তি বোধ করে দুজনে। কথা বলা দূরে থাক চোখ তুলে চাইতে পারে না পর্যন্ত, আপনা থেকেই নত হয়ে আসে চোখের পাতা। তাল কেটে যায় — যে প্রসঙ্গই উঠুক, কথা খেই হারায়।

মা'র অবস্থাই বেশি কাহিল। ছেলের চোখ-মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর কেমন ভয়-ভয় করে — স্বামীর মুখখানি যেন দেখতে পান ছেলের

মুখাবয়বে — ভয়ানক বিরক্ত হলে, কি রাগ করলে বা কোন রকম সন্দেহ দেখা দিলে স্বামীর মুখটিও অবিকল এই রকম হয়ে ওঠে।

এর আগে কোন দিন তিনি ছেলের সঙ্গে স্বামীর মুখের আদল খুঁজে পাননি। ছেলের দিকে তাকিয়ে এখন স্বামীর কথা কেবলি তাঁর মনে পড়ে। স্বামীর প্রতিনিধি হিসেবে যক্ষের মত তাঁকে আগলে বসে আছে সন্তান!

মন মোচড় দিয়ে ওঠে, বিবেক মাথা চাড়া দেয়, ভয়-ভয় ভাবটা পরিণত হয় আতঙ্কে।

হঠাৎ এডগার চোখ তুলল — চোখাচোখি হল — সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামাল দুজনেই।

জীবনে এই প্রথম যেন তারা পরস্পরকে গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে, দুজনেই এটা বুঝতে পারে। আর সীমাহীন গ্লানিতে বুকের ভেতরটা পাক দিয়ে ওঠে মা'র। এতদিন তারা চোখ বুজে পরস্পরকে বিশ্বাস করে এসেছে, আজ সেই বিশ্বাসের দেয়ালে ফাটল দেখা দিয়াছে — সন্দেহের শিশু-অশ্বথ ফাটল দিয়ে কচি মুখ বাড়িয়েছে, হয়ত একটু পরেই দেয়ালকে চৌচির করে পরিপূর্ণ ভাবে সে তার ডালপালা ছড়িয়ে দেবে।

একটু পরে মানে দু ঘণ্টা কি দুদিন বাদে।

অসহ্য ঘৃণায় একই সঙ্গে দুজনের হৃদয়-মন ভরে যায়।

হায়রে, কে জানত মা ও ছেলের মধ্যে পরস্পরের জন্যে এতখানি বিদ্বেষ আর ঘৃণা সঞ্চিত ছিল এতদিন!

গাড়ি হোটেলে পৌঁছোতে তিন জনেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। বেড়ানোটা একেবারে মাঠে মারা গেছে, — কিন্তু তা নিয়ে কেউ উচ্চবাচ্য করে না।

সকলের আগে এডগার গাড়ি থেকে নামে।

মাথা ধরেছে বলে শ্রীমতী সোজা নিজের ঘরে গিয়ে দরজা দেন।

গাড়োয়ানকে ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে স্টার্ণফেল্ড হোটেলের দিকে এগোয়। এডগারও যে পাশে পাশে চলেছে, খেয়াল নেই। কিশোর বন্ধুটির কথা সে বেমালুম ভুলে গেছে — অন্তত ভুলে না গেলেও এমন ভাব দ্যাখায় যেন রাস্তার একটা ছেলে এডগার, বড় জোর মুখ-চেনা আছে, তার বেশি নয়।

বন্ধুর দিকে তাকিয়ে এডগার মনে মনে গজরাতে থাকে। একটি কথাও বলছে না, একবার পাশ ফিরে চাইছে না পর্যন্ত! কেন, কি অপরাধ সে করেছে? বয়স্ক এক মানুষের বন্ধুত্বের মর্যাদা পেয়ে নিজের বয়েসের কথা সে ভুলে গিয়েছিল — মাটির খেলনার মত সে-মর্যাদা এখন ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল। আবার যে-কে সেই — অতি অসহায়, সকলের করুণার পাত্র সামান্য এক কিশোর মাত্র। এককেবার বন্ধুর মুখের দিকে তাকায়, আর গুটগুট করে পাশে পাশে চলে — বড় বড় পা ফেলে।

ঘরে ঢুকবে বলে স্টার্ণফেল্ড দরজার হাতলে হাত দিয়েছে, এডগার চাপা কান্নায় ভেঙে পড়ল।

'কি আমি করেছি! বলো, কেন তুমি আমার সঙ্গে কথা কইছ না? কেন মা-মণি আমায় আর ভালবাসছে না? কেন তোমরা দুজনে মিলে

আমার ওপর রাগ করেছ ? কি আমার অন্যায় ? আমি কি বদ্ ছেলে ? বলো, কথা বলো' —
কিশোরের স্বর শুনে স্টার্ণফেল্ড চমকে যায়। কথাগুলি তার একেবারে আঁতে গিয়ে ঘা দেয়।
'ছিঃ, একি, ছিঃ — অমন করে না। তুমি তো কিছু করনি, তুমি সত্যি ভালো ছেলে, লক্ষ্মী ছে-লে— তুমি ব'লে আমার বন্ধু !' স্টার্ণফেল্ড থতমত খায়, 'ব্যাপারটা কি জানো, আমার মনটাই আজ ভালো নেই, বন্ধু !'
কিশোরের চুলে বিলি কাটতে থাকে স্টার্ণফেল্ড। কিন্তু কিশোরের সজল চোখের দিকে তাকাতে তার সাহস হয় না, মুখ ঘুরিয়ে নেয়। বারো বছরের একটা বাচ্চার সঙ্গে প্রতারণা করতে হচ্ছে বলে মনটা খচখচ করে, তার জন্যে একটি সরল কিশোরের মন ভেঙে গেছে দেখে অনুতাপ জাগে।
'যাও তো সোনা, এখন খেলা করগে। সন্ধ্যেবেলা আবার আমরা গপ্প করব 'খন—সেই আগের মতন, কেমন !'
'আর মা-মণি যদি আমায় ঘুমুতে পাঠিয়ে দেয়, তাহলে ?'
'না, তা দেবেন না।'
'যদি দেয়—তুমি তাহলে মা'কে মানা করবে, বলো ?'
'আচ্ছা সে হবে 'খন — এখন যাও।'
'উঁহুঁ, আগে কথা দাও।'
'বেশ, দিলাম কথা। এখন ঘরে যাও দিকি। এখুনি তো আবার খাবার ডাক পড়বে, তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে রেডি হয়ে নাও গে।'
খানিকটা স্বস্তি পায় এডগার, খুশি মনেই ঘরে চলে যায়।

একটু পরেই কিন্তু তার মনের ভাব বদলাতে থাকে। ধীরে ধীরে আবার জেগে ওঠে অবিশ্বাস। একদিনেই বয়েস যে তার অনেকখানি বেড়ে গেছে !

তবু সে মুখ বুজে থাকে।

তিনজনে একসঙ্গে খেতে বসে।

রাত নটা বেজে গেল, কই, এখনো তো মা শুতে যেতে বলছে না? অস্বস্তি বোধ করে এডগার। হঠাৎ মা আজ এত ভালো মানুষ হয়ে গেল কেন? বন্ধু কি তাহলে সব মা'কে বলে দিয়েছে ?

রাত দশটা বাজতে শ্রীমতী উঠলেন, স্টার্ণফেল্ডের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। কিন্তু আশ্চর্য নির্বিকার স্টার্ণফেল্ড, একবারও সে বাধা দিল না, চুপচাপ বসেই রইল।

দেখেশুনে এডগারের চোখ কুঁচকে আসে।

ব্যাপার কি, অ্যাঁ? ভেতরে ভেতরে কোন মতলব নেই তো? মাথা নিচু করে গুটি গুটি পায়ে এডগার মা'র পিছন পিছন এগোয়। তারপর, দরজার কাছে গিয়েই, হঠাৎ মুখ তোলে — মা'কে একেবারে ধরে ফেলে হাতেনাতে। যা ভেবেছে — আড়চোখে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মা হাসছে মিটিমিটি, কথা কইছে চোখের ইশারায়।

এই ব্যাপার! অ্যাঁ!

এরই জন্যে অত তাড়াতাড়ি আজ শুতে যাওয়া হচ্ছিল ভালো

মান্নুষের মত! আসলে ভেতরে ভেতরে অন্য মতলব আছে তোমাদের!

বিশ্বাসঘাতক! না, মা না,—ওই বন্ধু। বন্ধুই তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। নির্ঘাৎ সব বলে দিয়েছে মা'কে। আচ্ছা!

'বদমাস!'

'কি বিড়বিড় করছিস এডি?' মা জিজ্ঞেস করেন।

'কিছু না।' দাঁতে দাঁত চেপে জবাব দেয় এডগার।

নিজেও সে একটা জিনিস গোপন করে যায়। কি সে জিনিস? ঘৃণা!

ওদের দুজনের প্রতি অপরিসীম ঘৃণায় সমস্ত মন তার ভরে ওঠে।

আট

এরপর থেকে এডগারের মন অনেকখানি শান্ত হয়ে এল।

মনে তার এখন এক মাত্র চিন্তা, একটি মাত্র আবেগের জোয়ার — ঘৃণা! এবার থেকে সরাসরি শত্রুতা।

ওদের শত্রুতা সাধনই যেন তার জীবনের ধ্যানজ্ঞান হয়ে ওঠে।

ওকে দেখলেই দুজনে ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করে—এডগার বুঝতে পারে। এবং বুঝতে পারে বলেই সব সময় ওদের পিছনে জোঁকের মত লেগে থাকে।

নিজের প্রাণ যায় যাক, কিন্তু ওদের প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলতে হবে।

এডগারের এই মনোভাব প্রথমে টের পায় স্টার্ণফেল্ড।

'এই যে এডি, গুডমর্ণিং।'

বন্ধুকে দেখে খুশি হওয়ার বদলে গম্ভীর নিস্পৃহ স্বরে এডগার শুধু বলে, 'মর্ণিং।'

'মা এখনো নামেননি বুঝি?'

তন্ময় চিত্তে খবর-কাগজ পড়ছে এডগার। আলগোছে ঘাড় নাড়ে, 'জানি না।'

ব্যাপার কি? স্টার্ণফেল্ড অবাক।

'তোমার শরীর আজ খারাপ নাকি, এডি?' স্বরে প্রচুর স্নেহের খাদ মেশায় স্টার্ণফেল্ড।

'না।' খবর-কাগজ ছেড়ে এডগার একরাশ মাসিক পত্রিকা টেনে নেয়।

বিচ্চু শয়তান একটা! গা রী-রী করে স্টার্ণফেল্ডের। সরে যায় সেখান থেকে।

যুদ্ধ ঘোষণা হয়ে গেল।

এডগার মা'র সঙ্গে কিন্তু ব্যবহার করে শান্ত সুবোধ বালকটির মত, মাত্রাতিরিক্ত শান্ত ও সুবোধ।

মা যখন মিষ্টি স্বরে বললেন যে, টেনিস খেলা তার শরীরের পক্ষে বড়ই উপকারী — সরাসরি নয়, অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গিতে সে সুস্পষ্ট অস্বীকৃতি জানাল। আদর করে মিষ্টি কথায় আর আমায় ভোলাতে পারছ না—হুঁ হুঁ বাব্বা!

মনে মনে তিক্ত হাসি হেসে এডগার হঠাৎ গায়ে পড়ে আব্দার জানায়, বলে, 'আমি তোমাদের সঙ্গে আজ বেড়াতে যাব মা-মণি?' বলেই হাঁ করে মা'র মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে — তার কথা শুনেই মা কেমন ভড়কে গেল ছাখ!

একটু চুপ করে থেকে মা বলেন, 'বেশ তো। এখানে তুই দাঁড়া, আমি আসছি।' ব'লে চা খাবার জন্যে তিনি খাবার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

দাঁড়িয়ে থাকে এডগার, অপেক্ষা করে। হঠাৎ তার মনে সন্দেহ দেখা

দেয়, আজ আবার ফাঁকি দিয়ে পালাবে না তো? বলা যায় কি! ওদিকের দরজা দিয়ে যদি পিট্টান দেয়? তার চেয়ে হোটেলের সামনে গিয়ে দাঁড়ানোই ভালো। হোটেল থেকে বেরোবার প্রত্যেকটি দরজায় তা হলে নজর রাখা যাবে। এবার সে কিছুতেই ওদের আর একা একা বেড়াতে যেতে দিচ্ছে না। ডিটেকটিভ উপন্যাস, জংলীদের নিয়ে লেখা গল্পের-বই ইত্যাদি পড়ে সে শিখে গেছে, কি ভাবে লুকিয়ে থাকতে হয়, লুকিয়ে লুকিয়ে শত্রুর গতিবিধি অনুসরণ করতে হয়, তারপর সুযোগ মত ঝাঁপিয়ে পড়তে হয় শত্রুর ওপর। হোটেল থেকে বেরিয়ে একটা কোণ্ দেখে সে লুকিয়ে রইল।

হুঁ, যা ভাবা — খানিক বাদেই দেখে কি, চোরের মত পা টিপে টিপে খিড়কির দরজা দিয়ে বেরোচ্ছে মা, হাতে এক-তাড়া গোলাপ। আর তার পাশে, একেবারে গা ঘেঁষে — আর কে — সেই বিশ্বাস-ঘাতক, তার বন্ধু!

বড় ফুর্তি দুজনের মনে। ভেবেছে, তাকে বড্ড ফাঁকি দিয়েছে, এখন আর ওদের পায় কে! মজাসে এবার নিজেদের সেই গোপন ব্যাপারটা চালিয়ে যাবে — এডিই যখন নেই তখন আর ভয় কাকে!

হিংস্র হাসিতে কিশোর গোয়েন্দার চোখ-মুখ ভরে যায়। কিছুই যেন দেখেনি, কিছুই জানে না — এমনি ভাবে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে সে এগোতে থাকে, ওদের দিকেই এগোয় অবিশ্যি। প্রায় কাছাকাছি গিয়ে পড়েছে, হঠাৎ শ্রীমতী ব্লুমেণ্টালের নজর পড়ে গেল।

'তুই এখানে! আর আমরা তোকে সারা রাজ্যি খুঁজে হয়রান্।'

কী দরদ! মা'র মুখের দিকে তাকিয়েই মিথ্যেটা স্পষ্ট ধরে ফেলে

এডগার। মনে তার আরও বেশি করে ঘৃণা উথলে ওঠে। মুখে কিন্তু কিছুই বলে না।

একটা ঝোপের পাশে তিন জন দাঁড়াল। কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এ ওর মুখের দিকে চায়।

হঠাৎ খানিকটা নার্ভাস হয়ে গিয়ে ভদ্রমহিলা গোলাপের তোড়াটা নাকের ওপর চেপে ধরলেন। ঘ্রাণ নেন কিনা বোঝা যায় না, তবে নাকের বাঁশি তাঁর ফুলে ওঠে। মা রেগে যাচ্ছে — এডগার বুঝতে পারে। কিন্তু তাতে বড় বয়েই গেল তার! সে অন্যদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে এক মনে বাগানের শোভা নিরীক্ষণ করতে লাগল।

'দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কি, এগোনই যাক।' অবশেষে শ্রীমতী বলেন। এবং সকলের আগে তিনিই পা বাড়ান।

তিন জন এসে সদর রাস্তায় উঠল।

'আজ সন্ধ্যেবেলা এক জায়গায় টেনিস খেলা হবে — দেখতে যাবে নাকি এডি? চল না?'

তাতানো হচ্ছে! ওতে আর সুবিধে হবে না বন্ধু। এডগার জবাবই দেয় না। বন্ধুর কথায় খুশি হওয়া দূরে থাকে — তার চোখে-মুখে বিরক্তির চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে ওঠে সিটি মারবার মত ঠোঁট সুঁচালো করে আনমনে সে এদিক-ওদিক তাকাতে থাকে।

তার সান্নিধ্য অন্য দু জন হাড়ে হাড়ে টের পায়। প্রহরাধীন আসামীর মত পথ হাঁটে তারা। এডগার কিছু বলে না, কিছুই করে করে না — তবু ক্রমেই যেন তার উপস্থিতিটা বেশি করে অস্বস্তিকর মনে হয়। চলার গতি শ্লথ হয়ে আসে, কথার উৎসাহ উধাও।

শেষ পর্যন্ত মা'র একেবারে অসহ্য হয়ে উঠল।

'কি হ্যালাখ্যাপার মত পায়ে পায়ে হাঁটছিস — এগো।'

বাধ্য ছেলেটির মত এডগার মা'র কথা শোনে। কিন্তু দু পা যায় আর পিছন ফিরে তাকায় — দ্যাখে, ওরা ঠিক-ঠিক আসছে কিনা। বেশি এগিয়ে গেলে দাঁড়িয়ে পড়ে, অপেক্ষা করে।

বড় আশা নিয়ে দুজনে আজ সফরে বেরিয়েছিল, এডগারের এই বেয়াড়াপনায় সব ভেস্তে গেল।

কি উজবুকের মত চুপচাপ রয়েছে ছেলেটা, কেমন তেরছা চোখে তাকাচ্ছে বারবার! ইচ্ছে থাকলেও স্টার্ণফেল্ড কাছে ঘেঁষতে সাহস পায় না — ব্যর্থ আক্রোশে মনে মনে খালি গজরায়। কত করে বলে মেয়েটার মনে কামনার আগুন জ্বালিয়ে তুলেছিল, প্রায় হাতের মুঠোয় এনে ফেলেছিল —এখন ছেলেটার জন্যে তীরে এসে বুঝি তরী ডোবে! বনের পথে পথে তিনজনে নিরুদ্দেশ ঘোরে ফেরে। চুপচাপ।

স্তব্ধ চারিদিক। হাওয়ায় গাছের পাতার সরসর ধ্বনি আর শুধু তাদের পায়ের মৃদু শব্দ — অন্য কোন আওয়াজ নেই কোথাও। একটি কিশোরের নির্বাক উপস্থিতিতেই কুলুপ পড়েছে দুটি প্রেমিকের মুখে।

মনে মনে খুশির অন্ত থাকে না এডগারের — কেমন মজা! বড় না হেনেস্থা করেছিলে আমায় — এখন? দ্যাখ আমি কী করতে পারি!

বন্ধু যে ভেতরে ভেতরে রেগে টং হয়ে যাচ্ছে, এডগার তা বুঝতে পারে। এবং টের পায় যে মা'র মেজাজও ক্রমেই চড়ছে। জানে তো, একটুতেই কেমন রেগে যায় মা।

কিন্তু যাই করুক যতই রাগুক, তাকে বকুক-মারুক চাইকি খুন করেও ফেলুক — তবু সে কাছ ছেড়ে একটুও নড়ছে না।

'চলুন, ফেরা যাক — আর কি!' খানিকটা হতাশ শোনায় শ্রীমতীর স্বর, খানিকটা-বা তিক্ত। এ অস্বস্তি তাঁর অসহ হয়ে উঠছে, এভাবে আর কিছুক্ষণ চললে কি করে বসেন ঠিক নেই।

মনে মনে শয়তানী হাসি হেসে ছেলে বলে, 'এক্ষুনি যাবে মা? কী সুন্দর বিকেল!—থাক না আরেকটু?'

এডগারের কথা শুনে দুজনেরই পিত্তি জ্বলে যায়। স্পষ্ট বুঝতে পারেন ক্ষুদে শয়তানটা ইয়ার্কি মারছে, কিন্তু বকতে কেউ-ই সাহস পান না। বকার কোন অজুহাত নেই — বাইরে যে একেবারে ভালমানুষটি সেজে রয়েছে। দুদিনেই ছেলেটা মনের ভাব গোপন করার দুরূহ তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করে ফেলেছে। মুখের দিকে তাকিয়ে ছাখ, কিচ্ছুটি যেন বোঝেন না — ভাজা মাছটি উল্টে খেতেও জানেন না — কিন্তু ভেতরে ভেতরে —।

চোখে চোখে দুজনের মধ্যে কথা হয়ে যায়, বাকনিষ্পত্তি না করে তিনজনেই হোটেলমুখো হয়।

এডগার মা'র পিছু পিছু ঘরে এসে ঢুকল।

শ্রীমতী এডগারকে দেখেও:দেখলেন না। একবার তিনি সোফায় গিয়ে বসেন, একবার গিয়ে দাঁড়ান জানালার কাছে — আবার হয়ত ঘরের মধ্যেই দ্রুত বারকয়েক পায়চারী করে নেন। দু দণ্ড স্থির থাকতে

পারেন না। এডগার তাকিয়ে তাকিয়ে ছাখে — বোঝে যে মা'র মেজাজ এবার সপ্তমে চড়ছে, যে কোন মুহূর্তে একটা কাণ্ড করে বসা অসম্ভব নয় — তবু সে ভয় পায় না, দমে না — বরং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা ছাখে। নিষ্ঠুর এক আনন্দ পায় মনে মনে।

'মাথাটা কি করে রেখেছিস, অ্যাঁ?' হঠাৎ তার দিকে তাকিয়ে মা ধমকে উঠলেন, 'হাতে-পায়ে ধুলো — যা, ধুয়ে আয় শিগগীর। বুড়ো ধাড়ি হতে চললে — এগুলো খেয়াল থাকে না!'

দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে বাথরুমের দিকে এগোয় এডগার — বুঝেছি গো বুঝেছি! এখন যে আমি দু চক্ষের বিষ, তাই আমার সবই এখন খারাপ। মন তার বিদ্বেষে ভরে যায়! বেশ টের পায়, দু'জনেই তাকে দেখে এখন ভয় পেতে শুরু করেছে, তার সামনে আর মন খুলে কথা কইতে পারছে না বলে ভেতরে ভেতরে রেগে আগুন হচ্ছে, চোখের সামনে থেকে তাকে এখন তাড়াতে পারলেই বাঁচে ওরা। যাক, শেষ পর্যন্ত—ওদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলতে পেরেছে এই ভেবেই খুশিতে সে উথলে ওঠে।

এদিকে সামান্য একটা ছেলের কাছে চাতুরীতে পরাজিত হওয়ার লজ্জায় দুজনেই যেন ক্ষেপে যায়। স্টার্ণফেল্ডের ইচ্ছে করে ছেলেটাকে ধরে দেয় কষে কয়েক ঘা। শ্রীমতী ব্লুমেণ্টাল তো কথায় কথায় ছেলের দোষ ধরেন, 'ভদ্র হয়ে বসতে শেখোনি?—পা নামিয়ে ভালো হয়ে বস!' 'দাঁত দিয়ে নখ খোঁটার অভ্যেস আবার কবে থেকে হল? —হাত সরা, সরা বলছি!' 'হাঁটার সময় অমন তিড়িং-বিড়িং করে লাফাও কেন?—হনুমান কোথাকার!' 'কাঁটা-চামচ দিয়ে প্লেটের ওপর

ওরকম শব্দ করো না, ভদ্রভাবে তাড়াতাড়ি খেয়ে-দেয়ে উঠে যাও। বড়দের সঙ্গে না গিললে বুঝি পেট ভরে না—না?'—উঠতে-বসতে প্রতি কথায় তিনি ছেলের খুঁৎ ধরেন, মনের সাধে ধমকে নেন।

ছেলে কিছু বলে না, শুধু দাঁতে দাঁত ঘষে, মুখে নামিয়ে গোঁ ধরে থাকে। মায়ের এত ধমক-ধামকের কারণটা যে কি তা সে ভালো ভাবেই বুঝেছে। এবং বুঝেছে বলেই মা'কে রাগিয়ে দিতে পারায় রীতিমত গৌরব বোধ করে, খুশি হয় মনে মনে। বিকারগ্রস্ত রোগীর পাশে ডাক্তারের মত নির্বিকার ভাবে বসে বসে সব শুনে যায় — কোন কথার প্রতিবাদ করে না। প্রচণ্ড ঘৃণাই তার মনে এই সংযমের বাঁধ তৈরী করেছে — ওদের কথায় রাগ করবে কি, ওদের মত হিংসুকদের সে মানুষের মধ্যে ধরলেতো! দুদিন আগে হলে অবিশ্যি অন্যরকম ব্যাপার হত, কিন্তু এখন সে একেবারে আলাদা, সম্পূর্ণ নতুন এক মানুষ হয়ে গেছে।

খাওয়ার পাট চুকলে শ্রীমতী উঠে দাঁড়ালেন, বাধ্য ছেলের মত যথারীতি মা'র সঙ্গে যাওয়ার জন্যে এডগারও উঠে পড়ল।

তাই না দেখে মা আরো গেলেন ক্ষেপে, 'কোলের খোকার মত সব সময় পায়ে-পায়ে চলিস কেন বল ত? তোর এই ন্যাকামো দেখলে গা জ্বলে যায়। বুড়োধাবড়া ছেলে নাকি সব সময় মা'র আঁচল ধরে থাকে! যা, একা একা যা খুশি করগে যা—দোহাই তোর, চোখের সামনে থেকে দূর হ। বই নিয়েও তো একবার বসতে পারিস—তা না, সব সময় আঠার মত লেগে আছে!'

এই তো, এই—বার! দাঁতে দাঁত ঘষে এডগার—রাগের মাথায় সত্যি কথাটা তো মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল!

'বাবা তো আমায় একা একা থাকতে মানা করেছে মা-মণি।' সুবোধ ছেলের মত এডগার বলে, 'সব সময় তোমার কাছে কাছে থাকতে বলেছে।'

'বাবা' শুনেই মা ভীষণ মুষড়ে পড়েন। তাই দেখে এডগার ভাবে, বাবার নামে মা'র মুখখানা হঠাৎ অমন হয়ে গেল কেন? নিশ্চয় ওদের গোপন ব্যাপারের সঙ্গে বাবারও কোন সম্পর্কে আছে। হুঁ, নির্ঘাৎ, নইলে বাবার নামে শুনেই মার মুখে রা নেই?

কোন কথা না বলে শ্রীমতী ঘর থেকে বেরিয়ে যান, স্টার্ণফেল্ড যায় পিছনে পিছনে। সকলের শেষে এডগার — দুজন কয়েদিকে যেন পাহারা দিয়ে নিয়ে চলেছে এমনি ভাবে এগোয় সে। অদৃশ্য এক লোহার শিকলে দুজনকেই যেন বেঁধে ফেলেছে — ওদের চলার তালে সেই শিকলের নিঃশব্দ ঝনঝনা শুনতে পায় এডগার।

নয়

স্টার্ণফেল্ডের ছুটি শেষ হতে আর মাত্র কয়েকটা দিন। বাকি কটা দিন সে সুদে-আসলে পুষিয়ে নিতে চায়। কিন্তু পথের কাঁটা ওই ছেলেটা। সামান্য একটা ছেলের সঙ্গে প্রকাশ্যে শত্রুতা করতে ওর মন সায় দেয় না। যা কিছু করার ওর আড়ালে-আবডালে লুকিয়ে-চুরিয়ে করতে হবে। এটা অবিশ্যি একদিক দিয়ে তাদের পরাজয়ের শামিল, কিন্তু কি করা — নইলে যে একূল-ওকূল দুকূল যায়।

'যাতো বাবা, দৌড়ে গিয়ে পোস্টাপিসে চিঠিটা রেজিস্ট্রি করে দিয়ে আয়।'

ঘরের মধ্যে মা ও ছেলে। স্টার্ণফেল্ড বাইরে গাড়ি ঠিক করছে। এডগার মা'র দিকে সন্দেহের চোখে তাকাল। মতলব কি? হোটেলের চাকরই তো রোজ চিঠি-পত্তর দিয়ে আসে—নিয়ে আসে। আজ আবার তাকে নিয়ে টানাটানি কেন?

খানিক ইতস্তত করে এডগার। বলে, 'আমায় ফেলে যাবে না তো? কোথায় থাকবে তোমরা?'

'কোথায় আবার, এখানেই থাকব। শিগগীর যা।'

'ঠিক বলছ? আমার দিব্যি?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বলছি। যা এখন!'

'কিছুতেই আমায় ফেলে যাবে না?

অনুনয় নয়, হুকুম যেন। মাকে হুকুম করছে ছেলে! দুদিনেই মা ও ছেলের সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে এই রকম।

চিঠি নিয়ে এডগার ছুটে বেরিয়ে যায়। স্টার্ণফেল্ড হোটেলে ঢুকছিল — তার সঙ্গে ধাক্কা-ধাক্কি হয়ে গেল।

'আমি একবার পোস্টাপিসে যাচ্ছি — যাব আর আসব। মা-মণি আমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। আমায় ফেলে তোমরা যেও না, কিন্তু কেমন?' বিরোধ দেখা দেবার পর এই প্রথম এডগার সেধে স্টার্ণফেল্ডের সঙ্গে কথা বলল।

'পাগল! তাই কি হয়।' মিটি-মিটি হাসে স্টার্ণফেল্ড।

পোস্টাপিসে প্রচণ্ড ভিড়, এডগারের বেশ খানিকটা দেরী হয়ে গেল। কাজ শেষ করে রসিদটা নিয়েই সে হোটেলের দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে রওনা হয়। তারপর হোটেলের কাছাকাছি এসে দূর থেকে দ্যাখে কি — মা আর স্টার্ণফেল্ডকে নিয়ে গাড়িটা পথের বাঁকে মিলিয়ে যাচ্ছে!

অসহ্য রাগে ক্ষোভে দুঃখে ঘৃণায় সর্বশরীর কাঁপতে থাকে এডগারের। শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যি ওরা তাকে ফেলে চলে গেল! এত করে বলা সত্ত্বেও কথা রাখল না! ছোট ছেলেকে মিথ্যে কথা বলে ফাঁকি দিতো

আটকাল না! ছি ছি, কি ঘেন্নার কথা! কী ছোট মন! মিথ্যেবাদী, যত সব মিথ্যেবাদী! মা যে মিথ্যে কথা একেবারে বলে না তা নয়, তাই বলে, গা ছুঁয়ে দিব্যি গেলেও তা রাখল না? সে না তার মায়ের ছেলে? এই নাকি মায়ের কাজ! ছি! ছি!

মায়ের ওপর ছেলের সমস্ত বিশ্বাস গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায়। মায়ের কথার, মায়ের গা-ছুঁয়ে-দিব্যি-করারও তা হলে কি কোন দাম নেই? কিন্তু কেন, কেমন কেন এমন করল মা? মা-মণি তো তাকে কত ভালোবাসে — অন্তত আগে তো বাসত! এখন কেন তবে এমন হয়ে গেল?

নিশ্চয় সেই গোপন ব্যাপারটাই এর জন্যে দায়ী! সেটা এমন মারাত্মক এক ব্যাপার যার জন্যে বড়দেরও ছোটদের কাছে মিথ্যেবাদী হতে হয়, চোরের মত ছোটদের কাছ থেকে দূরে দূরে সরে থাকতে হয়, পাঁচজনের চোখের সামনে থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হয়। অনেক ডিটেকটিভ বই সে পড়েছে। সেসব বইয়ে দেখেছে, চোরেরা আর খুনীরা সব সময় কেবলি লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়ায়। কিন্তু এরা কি করেছে — চুরী, না খুন? এরা কেন তার কাছ থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে? কি এরা সব সময় লুকিয়ে রাখতে চাইছে?

ভেবে ভেবে সারা হয়ে গিয়েও এডগার হদিস পায় না ভাবনার। মাথার মধ্যে সব কিছু গুলিয়ে যায়। ভাবে, ইশ্, চট করে যদি বয়েসটা তার এক্ষুণি দশ বছর বেড়ে যেত! তাহলে নির্ঘাৎ সে সব কিছু ফস করে বুঝে ফেলত। কিন্তু চট করে কি আর বয়েস বাড়ে ছাই!

'যত্ত সব মিথ্যেবাদী! বদমাস্! বিশ্বাসঘাতক! হনুমান! বাঁদর! ইয়ে—!'

বুকের মধ্যে নিশ্বাস ডেলা পাকিয়ে যায়। গত কদিন ধরে যত ঘৃণা-বিরাগ-বিদ্বেষ মনে মনে পুষে রেখেছিল, বাঁধ-ভাঙা বন্যার মত কান্না হয়ে সব বেরিয়ে আসে। ওদের এই বিশ্বাসঘাতকতা আর নিজের নিদারুণ অসহায়তার কথা মনে করে অকথ্য জ্বালায় কচি বুকখানি তার জ্বলে পুড়ে খাক হতে থাকে।

এডগার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। এত কান্না জীবনে আর কোন দিন সে কাঁদেনি— এ তার জীবনের স্মরণীয়তম কান্না। কেঁদে কেঁদে চোখের জলে যেন তার কৈশোরকে সে বিদায় দেয় চিরজনমের মত। জীবনের সবচেয়ে মহার্ঘ্য যে সব সম্পদ—শ্রদ্ধা ভক্তি প্রেম ভালোবাসা আর বিশ্বাস — কান্নার বন্যায় সব কিছু ভেসে যায় তার মন থেকে হৃদয় থেকে—বারো বছরের জীবন থেকে।

এডগার যখন হোটের দোরগোড়ায় পা দিল, একেবারে নতুন মানুষ—আরেক মানুষ। মনে মনে সে তার পথ ঠিক করে নিয়েছে, চোখে মুখে ফুটে উঠেছে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের প্রতিজ্ঞা। প্রথমে নিজের ঘরে গিয়ে ভালো করে চোখ-মুখ ধুয়ে ফেলল, মুছে ফেলল দুর্বলতার সজল স্বাক্ষর। তারপর শত্রু দুজনের সঙ্গে একটা হেস্তনেস্ত করার জন্যে মনে মনে প্রস্তুত হতে লাগল। তাদের ফেরার প্রতীক্ষায় স্থির হয়ে বসে রইল।

ওরা যখন গাড়ি থেকে নামল, হলঘর জমজমাট। দাবা নিয়ে দুজন ভদ্রলোক আসর সরগরম করে তুলেছেন। একপাশে কয়েকটি ভদ্রমহিলা—প্রত্যেকেই একসঙ্গে কথা বলায় শশব্যস্ত। কয়েকজন খবরের কাগজ বা মাসিক পত্রিকায় তন্ময়। আর এই বড়দের ভিড়ে ঈজিচেয়ারে দিব্যি হেলান দিয়ে ভারিক্কি মুখে বসে আছেন শ্রীমান এডগার। ঘরে ঢুকেই তাকে এ অবস্থায় দেখে দুজনে তো মহা অপ্রস্তুত।

'এই যে, আসুন স্যার—আপনার সঙ্গে গোটাকয়েক কথা আছে।'

এডগারের আপ্যায়নে বেকুব স্টার্ণফেল্ড।—'ও, নিশ্চয় নিশ্চয়,' ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে সে বলে, 'দাঁড়াও, এক মিনিট' বলেই পাশ ফেরে।

'না না, এক্ষুণি,' হলঘরের প্রত্যেকটি লোককে শুনিয়ে শুনিয়ে এডগার চেঁচিয়ে ওঠে 'এক্ষুণি আমি কথাটা বলতে চাই স্যার। অমন বোকার মত তাকিয়ে আছেন কেন? শুনুন—কেন আপনি আমায় ধাপ্পা দিয়েছিলেন? আমার না ফেরা পর্যন্ত মা অপেক্ষা করবে বলে দিব্যি করেছিল, আপনিও তা জানতেন, তবু কেন আপনি– ।'

'এডগার! এডি! খোকা!' মা ছুটে এলেন।'

আশেপাশের প্রত্যেকটি লোক ফিরে তাকিয়েছে!

এই তো সুযোগ–এই বার? চারদিক দেখে নিয়ে এডগার শুরু করে, 'ফের আমি বলছি, চিৎকার করে বলছি–সবাই শুনুক। আপনি আর তুমি–তোমরা দুজনেই আমায় মিথ্যে কথা বলেছিলে, আমায় ধাপ্পা দিয়েছিলে! এত ছোট, এত নীচ তোমরা!' দুই চোখ দিয়ে তার আগুন ঠিকরোয়।

শাদা হয়ে যায় স্টার্ণফেল্ডের মুখ।

শ্রীমতী ছেলের হাত মুঠো করে ধরে ধমকে ওঠেন, 'আয়, শিগগীর ঘরে আয়—নইলে সকলের সামনে চড়িয়ে তোমায় শায়েস্তা করব—শয়তান কোথাকার!'

এডগারের মন এখন শান্ত হয়ে এসেছে। মনের সাধে দুকথা শুনিয়ে দিতে পেরেছে ভেবে ভারী তৃপ্তি বোধ করছে মনে মনে। ধীরে সুস্থে সে উঠে দাঁড়াল—দরজার দিকে পা বাড়াল।

এদিকে অসংখ্য জোড়া কৌতূহলী চোখের সামনে তার মা-মণির অবস্থা হয়ে উঠেছে যারপরনাই কাহিল।

'আমার ছেলের এই ব্যা-ব্যাবহারের জ-জন্যে,' শ্রীমতী তোতলাতে থাকেন, 'দয়া করে কেউ কিছু ম-ম-মনে করবেন না। হাজার হলেও — ছে-ছেলে-মানুষ —, আমি ওর হয়ে মা-মাপ চাইছি।'

কলঙ্কে তাঁর বড় ভয়। আড়ালে তাঁকে নিয়ে কেউ ফিসফাস করছে, তিনি ভাবতেও পারেন না। কিন্তু পরিস্থিতি যা দাঁড়াল, সামলান শক্ত। নিজের মান বাঁচাবার জন্যে তিনি সঙ্গে সঙ্গে হলঘর ছেড়ে গেলেন না, সহজ স্বাভাবিক ভাবেই কিছুক্ষণ কথাবার্তা কইবার চেষ্টা করলেন। বেশ খানিক পরে উঠে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। বুঝতে পারলেন যে এর জের এত সহজে মিটবে না — তাঁর উঠে আসার সাথেসাথেই সকলে হয়ত গুজগাজ শুরু করে দিয়েছে।

ব্যাপারটা কতদূর পর্যন্ত গড়াতে পারে ভাবতে গিয়ে শ্রীমতীর আতঙ্ক জাগে। এমনিতে ছেলেকে তিনি বড় একটা বকেন-টকেন না — কিন্তু আজ ছেলেই তাঁর সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজেও অবিশ্যি

কিছুটা বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন, কিন্তু এখন কি করা ? কিং কর্তব্যম ? দুদিন থেকে ছেলেটার কথাবার্তার ধরনই কেমন আলাদা হয়ে গেছে। তাছাড়া, যেমন পিতৃভক্ত পুত্র — ভাবতেও ভয় হয়। ছেলেকে যে শাসন করবেন, সাহসে কুলোয় না। এ নিয়ে বেশি হইচই করলে সব যদি জানাজানি হয়ে পড়ে ? ছেলের আর কি, তাঁরই হবে সর্বনাশ।

বারান্দায় খানিক পায়চারী করে শ্রীমতী আস্তে আস্তে ঘরের দরজা খুললেন — এডগার তখনো বসে। চোখেমুখে না ভয় না কৌতূহল — কিছুর চিহ্নমাত্র নেই। কিছুই হয়নি, কোন অন্যায়ই যেন করেনি — ভাবখানা এমনি শাদা-সরল।

স্নেহকোমল স্বরে মা বলেন, 'একা একা বসে কি ভাবছিস রে খোকা ? ইশ্, তুই আজ যা লজ্জায় ফেলিছিলি! আচ্ছা, বড়দের ব্যাপারে তুই কথা বলতে যাস কেন বল ত ? তোমার কিন্তু কাল ওই ভদ্রলোকের কাছে মাপ চাওয়া উচিত — যাই বলো।'

'কক্‌খনো না।' জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থেকে নিস্পৃহ ভাবে এডগার জবাব দেয়।

'কি বললি, না ? দুদিনেই একি হলরে তোর ? এত ভালো ছেলে তুই, তোকে বলে আমি কত ভালোবাসি — রাতারাতি তুই এমন হয়ে উঠলি কি করে ? ভদ্রলোক তোর কি ক্ষতিটা করেছেন, শুনি ? এই সেদিনও না ওঁর মহা ভক্ত ছিলি, আজও উনি বারবার তোর কথা বলছিলেন —'

'বলছিলেন না ঘোড়ারডিম ! তোমার সঙ্গে ভাব করবার জন্যেই ও —'

'আঃ!' থতমত খেয়ে মা ধমকে ওঠেন, 'কী যা-তা বলছিস!'

'যা-তা বইকি ! ও একটা মিথ্যেবাদী — ভীষণ মিথ্যেবাদী। স্বার্থপর —

হিংসুকে! তোমার সঙ্গে ভাব করার মতলব ছিল কিনা, তাই সেধে, সেধে আমার সঙ্গে আগে কী খাতির! নিজেই গায়ে পড়ে বন্ধুত্ব করলে একটা কুকুর দেবে বললে — কই, দিয়েছে? জোচ্চোর কোথাকার! জানিনা তোমার আবার কি দেবে বলে বন্ধুত্ব করেছে — কিন্তু এই আমি বলে দিচ্ছি মা, ও তোমাকেও ফাঁকি দেবে, কিস্সু দেবে না। হুঁ, নির্ঘাৎ! ও একটা মহা মিথ্যেবাদী — ছোটলোক, হনুমান! ওটাকে দেখলে আমার ঘেন্না হয়, বমি আসে! মিথ্যেবাদী কোথাকার — বদমাস — ইয়ে!'

'ছি এডগার,!' মা যথাসম্ভব সংযতভাবে বাধা দেন, ছি ছি বাবা, এভাবে কথা বলে না।'

'ওর হয়ে তুমি কথা কইতে এসো না, মা। তুমি তো আমার চেয়ে কত্ত বড়, নিজে তুমি বুঝতে পার না—কেমন ধারা লোক ও? ভদ্দরলোক! ভদ্দরলোক হলে আমায় দেখে ভয় পায় কেন? নিশ্চয় ওর মনে বদ মতলব আছে, সব সময় সেটা আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে চায়। কেন জানো? ও বুঝতে পেরেছে, হুঁ বাব্‌বা — এডির কাছে চালাকি নট — এডি স-ব বুঝতে পারে, — বাঁদর!'

'তুমি ওঁকে গালাগাল দিচ্ছ খোকা? ছি! ছি!'

শ্রীমতী বিভ্রান্ত। শুধু 'ছি ছি' ছাড়া আর কোন শব্দই তাঁর মুখ দিয়ে বেরয় না। দুর্বোধ্য একটা ভয়ে তিনি অতিমাত্রায় অভিভূত হয়ে পড়েন। কিন্তু প্রেমিক না সন্তান — কার জন্যে এই ভয় ভেবে কোন কূলকিনারা পান না।

এডগার বুঝতে পারে তার কথায় কাজ হচ্ছে। মা'কে চুপ করে

থাকতে দেখে ধরে নেয় যে মা-ও তার সঙ্গে একমত। খুশি হয়ে ওঠে এডগার। মা'র দিকে তাকিয়ে মায়া জাগে, ফলে সবটুকু বিদ্বেষ গিয়ে পড়ে স্টার্ণফেল্ডের ওপর।

মা'র কাছে সরে এসে দুহাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে বলে, 'মা-মণি! তুমিও কি বুঝতে পার না মা-মণি কত বড় বদমাস ওই লোকটা? ও খালি তোমার সঙ্গে একলা একলা কথা কইতে চায় কিনা, তাই আমার নামে কী সব হয়ত তোমার কাছে লাগিয়েছে। নইলে কি আমায় তুমি বকতে? ককখনো না। তুমি ব'লে আমায় ক-ত ভালবাস! ও কিন্তু তোমাকেও ঠকাবে মা-মণি, সাবধান! এখন হয়ত বলবে এটা দেব ওটা দেব — পরে কিন্তু কলা দেখাবে। দেখলে না, কেমন দেব বলেও কুকুরটা আমার দিলে না? ও আমায় ঠকিয়েছে, তোমাকেও ঠকাবে। ওকে কিছু বিশ্বাস নেই — ও একটা জোচ্চোর, মিথ্যেবাদী!

মা'র মনে হয়, ছেলে যেন তাঁরই মনের কথা বলছে। ছেলে নয়, ছেলের মুখ দিয়ে তাঁর মনই যেন কথা কইছে। কিন্তু ছেলের কাছে এভাবে হার মানতে লজ্জায় তিনি মরমে মরে যান।

বড়রা কখনো ছেলেদের কাছে হার মানে না, ন্যায়ত হেরে গেলেও না। হঠাৎ শ্রীমতী সোজা হয়ে বসেন।

গম্ভীর গলায় বলেন, 'হয়েছে, থাম এবার। এসব ব্যাপারে ছোটদের মাথা ঘামানো ভালো না — বড়দের ব্যাপার বড়রা বুঝবে, ছোটরা এর কি বোঝে? নিজে তুমি সভ্যভব্য হয়ে চলো, তাহলেই যথেষ্ট।'

মা'র ওপর একটু একটু করে মমতা জাগছিল, মার কথাতেই সেটা উবে গেল।

উঠে দাঁড়ায় এডগার, 'আচ্ছা বেশ! পরে কিন্তু বল না যে আমি তোমার সাবধান করে দিইনি ?'

'তুই তাহলে মাপ চাইবি নে!'

'না, চাইব না।'

মুখোমুখি অপলক দুজনে — মা ও ছেলে।

কয়েক সেকেণ্ড কেউ কারো চোখ থেকে চোখ সরাতে পারে না। অবশেষে মা'ই মুখ ঘুরিয়ে নেন, বোঝেন, ছেলে তাঁর নাগালের বাইরে চলে গেছে।

'বেশ, যা খুশি তোমার কর। তবে শোনো, এখন থেকে তোমার খাবার এঘরে দিয়ে যাবে। যদ্দিন না তুমি ওঁর কাছে মাপ চাও, আমাদের সঙ্গে খেতে পাবে না — নিজের ঘরে একলাটি খাবে। আমায় জিজ্ঞেস না করে ঘর থেকে বেরতেও পাবে না — বুঝলে ? সাপের পাঁচ-পা দেখেছে, না ? — দাঁড়াও!'

হুঁঃ! মুখ বেঁকিয়ে হাসল এডগার। বুড়োদের মত এভাবে মুখ বেঁকিয়ে হাসা যেন তার কতদিনের অভ্যেস!

নিজের ওপরই তার রাগ হয়ে যায়। এ-ই মা'কে সে কিনা গিয়েছিল সাবধান করে দিতে! ওই লোকটার মতই মিথ্যেবাদী হয়ে উঠেছে মা-টা। একেই কিনা সে দুষমনের হাত থেকে বাঁচতে চায়! ছ্যাঃ!

ছেলের দিকে না তাকিয়ে শ্রীমতী দরজার পাট বন্ধ করে দিলেন। ছেলের দিকে চোখাচোখি তাকাতে তাঁর আতঙ্ক জাগে। রাতারাতি ও যেন একেবারে পাকাপোক্ত হয়ে উঠেছে, দুনিয়ার অনেক কিছু জেনে-শুনে ফেলেছে।

ও যেন শুধু তাঁর পেটের সন্তান নয়, তাঁর বিবেক। মূর্তিমান বিবেকই যেন সন্তানের রূপ ধরে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এতদিন ছেলেকে মনে হত সুন্দর একটি খেলনা, খেলার পুতুল, তাঁর নারীত্বের অলঙ্কার। হয়ত কখনো-সখনো বিরক্তি জেগেছে, খানিকটা বোঝা বলেও কখনো-বা মনে হয়েছে, কিন্তু মোটামুটি ভাবে ছেলেকে নিয়ে নিয়ে ছিলেন খুশি, তৃপ্ত। এতদিন একই খাতে বয়ে চলেছে মা ও ছেলের নিস্তরঙ্গ জীবনধারা।

কিন্তু —

কিন্তু আজ এই প্রথম মনে হল, তাঁর চলার পথে সবচেয়ে বড় প্রতি-রোধের পাঁচিল তাঁর নিজের সন্তান।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতেও যেন কানে এসে বাজে একটি কিশোর কণ্ঠের হুঁশিয়ারী। এ হুঁশিয়ারী উঠছে তাঁরই মনের গভীর থেকে — কিন্তু অসহায় তিনি, বড় অসহায়! এই হুঁশিয়ারীর কণ্ঠরোধ করার সাধ্য নেই তাঁর।

সিঁড়ির পাশে একটি আয়না। শ্রীমতী দাঁড়ালেন। আয়নার দিকে তাকালেন। অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইলেন নিজের দিকে — নিজের প্রতিবিম্বের দিকে অপলক তাকিয়ে থেকে হৃদয়ের অতলে যেন ডুব দিতে চাইলেন। হঠাৎ চোখ পড়ল ঠোঁটের উপর — ঈষৎ-হাসিতে বিস্ফারিত, কাঁপছে মৃদু মৃদু, কী-একটা মধুর শব্দ যেন উচ্চারণ করতে চাইছে — মধুর নয়, মারাত্মক।

মনের মধ্যে সেই হুঁশিয়ারীটা আবার ঝনঝন করে বেজে ওঠে —

নিজেকে তিনি একবার ঝাঁকি দিয়ে সামলে নেন, শরীর থেকে সমস্ত গ্লানি যেন মুহূর্তে ঝেড়ে ফেলেন।

আয়নার সস্মিত মুখটির দিকে আবার তাকান, বেশবাস ঠিক করে নেন।

তারপর — তারপর জুয়াড়ীর জিদে এগিয়ে চলেন।

দশ

চাকর এসে এডগারের খাবার দিয়ে গেল। তারপর তার কোন প্রয়োজন আছে জিজ্ঞাসাবাদ করে যাওয়ার সময় বাইরে থেকে দরজার শিকল তুলে দিল।

অসহ্য। মনে মনে গর্জে ওঠে এডগার। সে কি জন্তু-জানোয়ার নাকি যে এভাবে তাকে ঘরে বন্ধ করে রাখা হচ্ছে? তার মা'ই কি করাচ্ছে এসব? মা!

··· আচ্ছা, আমাকে এভাবে ঘরে আটকে রেখে নিচে এখন ওরা করে কি? কী বলাবলি করছে? তবে কি আমাকে বাদ দিয়ে সেই গোপন ব্যাপারটা নিয়ে এখন কথা কইবে? কি, কী সেই গোপন ব্যাপার? ইশ্, এত বড় হয়ে গেছি, তবু ছাই কিছু বুঝতে পারিনে! রাত্তিরবেলা আমায় এভাবে আটকে রেখে না জানি নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করে কত কি ওরা বলাবলি করছে! লুকিয়ে লুকিয়ে যদি ওদের কথাগুলো শুনতে পারতুম! কী এমন সেই গোপন ব্যাপার? ··· একেকবার মনে হয়, একটু-একটু

যেন বুঝতে পারছি, কিন্তু একটু পরেই আবার স-ব গুলিয়ে যায়। এই রকমটা অবিশ্যি আগেও হয়েছে। ··· বাবার আলমারীতে অনেক বই আছে, অনেক-অনেক গোপন ব্যাপার নাকি লেখা আছে সেগুলোর মধ্যে, কতবার তো লুকিয়ে পড়েছি — কিন্তু ছাই কিচ্ছু বোঝার যো নেই। পাতার পর পাতা পড়ে যাই, গোপন ব্যাপারটাই ধরতে পারিনে! বুঝি-বুঝি করেও কিছু বুঝিনে। ··· সেবার একটা জায়গা এমাদিকে বুঝিয়ে দিতে বললুম, আমার কথা শুনে সে কী হাসি এমা'দির! ··· উঃ, ছেলেমানুষ হওয়া যে কি ঝকমারী! কত কী-যে জানতে ইচ্ছে করে, কিন্তু কারুকে কিচ্ছুটি জিজ্ঞেস করার যো নেই। বড়রা খালি ধমকায়, এমনভাবে তাকিয়ে থাকে যেন আমরা ছোটরা সব এক-একটি আস্ত গাধা! কিন্তু উঁহুঃ, আমিও বাবা ছাড়ছি না — সব আমি জানবই জানব······

হঠাৎ কাণ খাড়া করে ওঠে এডগার — কার যেন পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে না?

না, ও হাওয়া। ঝিরঝিরে হাওয়ায় বাগানের গাছপালার সরসর শব্দ হচ্ছে। চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে বাগানময়, হাওয়ায় গাছের ডাল নড়ছে, কাঁপছে ডালের ছায়ারা।

···নির্ঘাৎ ওরা খুব খারাপ কোন কাজ করছে, নইলে কেন বারবার বোকার মত খালি মিথ্যে কথা বলে? আমাকে ফাঁকি দিতে পেরেছে বলে নির্ঘাৎ এখন দুজনের খুব হাসাহাসি হচ্ছে। আচ্ছা, আমিও দেখে নেব, দাঁড়াও না! ··· ইশ, ঘরে আটকা থেকে কী বোকামিটাই যে করেছি — ওদের যদি এখন চোখে-চোখে রাখতে পারতুম! ··· লুকিয়ে-

লুকিয়ে কোন কাজ করার সাধ্যি বড়দের নেই, যতই লুকোক, ছোটদের কাছে ঠিক ধরা পড়ে যায়। ওরা ভাবে, বিছানায় শুয়েই বুঝি আমরা ঘুমিয়ে পড়ি — কিন্তু বোকারা তো আর জানেনা স-ব আমরা টের পাই। ওরা যা-যা বলে সব শুনি, ওদের সব কাণ্ডকারখানা দেখি। ওরা আমাদের যত বোকা ভাবে আমরা কি অত বোকা নাকি — হুঁঃ। ··· এই তো সেদিন, দুমাস আগে ক্লারা কাকিমার ছেলে হল, সবাই এমন ভাব দেখাল যেন আগে-থেকে কিছুই কেউ জানত না — খোকনকে দেখে সবাই একেবারে যেন ভী-ষণ অবাক হয়ে গেছে। আসলে কিন্তু সব্বাই আগে ভাগেই জানত যে কাকিমার ছেলে হবে। ওই নিয়ে কত কথা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেছে, আমি যেন শুনিনি! ······

··· এবারও মা আর ওই লোকটা যেন কি লুকোতে চাইছে — আমার কাছ থেকে লুকোবে! আমি ঠি-ক জেনে ফেলব। ইশ, এই দরজাটা যদি কাচের হত! তাহলে আমি কেমন ওদের দেখতে পেতুম, অথচ ওরা? ওরা কিছু টেরও পেত না। আচ্ছা, ঝি'কে ডাকলে কেমন হয়? সে যাঁহাতক দরজা খুলে ঘরে এসে ঢুকবে— আমিও অমনি পাশ কাটিয়ে ফুড়ুৎ করে ······ উঁহু, ওতে কাজ হবে না, সব তাহলে জানাজানি হয়ে যাবে। চাকরবাকররা টের পেয়ে যাবে — সকলেই দেখবে আমায় ঘরে বন্ধ করে রেখেছিল। সে বড্ড অপমান। না না, সে অসম্ভব। সে আমি সইতে পারব না। কিন্তু কাল ······

···বাগানে কে যেন হাসল না? মা? বোধ হয়! মা-মনি তো এখন হাসবেই, হাসবে না! তাকে ঘরে আটকে রেখে খুশি যে আর ধরে না ওদের!

জানালার কাছে এসে এডগার উঁকি মারে — দুটি মেয়ে বাগানে পায়চারী করছে, সাথে দুজন লোকও রয়েছে। আর কেউ কোথাও নেই।

হঠাৎ তার নজরে পড়ল, জানালাটা খুবই নিচু।

তারপর আর কিছু ভাববার আগেই সে জানালা দিয়ে দিল এক লাফ, হুমড়ি খেয়ে পড়ল গিয়ে একটা ফুলগাছের ওপর।

সামান্য শব্দ হল, কিন্তু না, কেউ শোনেনি। এখন সে মুক্ত। অনায়াসে এখন শত্রুর উপর গোয়েন্দাগিরি করা চলে। এই দুদিনে গোয়েন্দাগিরি করা যেন তার স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। ছোট্ট এডি এখন পুরোদস্তুর পাকা এক গোয়েন্দা হয়ে উঠেছে।

কোন শব্দ না করে পা টিপে-টিপে সে এগোতে থাকে। বুক দুরদুর করছে। খাবারঘরের জানালার নিচে এসে থামে, চারপাশ দেখে নিয়ে জানালায় উঁকি দেয়। না, এঘরে কেউ নেই। তারপর পাশের ঘরের জানালায় গিয়ে একবার উঁকি মারে, উঁহুঁ — এও ফাঁকা। তার পরের ঘর — নাঃ, কোথাও ওরা নেই। হতাশায় মুষড়ে পড়ে এডগার। হঠাৎ দেখে কি, খিড়কির দরজা খুলে গেল, আর দুটি ছায়ামূর্তি বেরিয়ে এল দরজা দিয়ে।

তাড়াতাড়ি উবু হয়ে বসে পড়ে এডগার।

হ্যাঁ, তার মা-ই! আর সঙ্গে—সেই লোকটা!

এইবার? এডগার চাঙ্গা হয়ে ওঠে, এইবার তোমরা যাবে কোথায়! কি যেন ওরা বলছে, কিন্তু হাওয়ার শব্দে কি ছাই শোনার যো আছে কিছু! গাছের পাতাগুলো এমন বিচ্ছিরি শব্দ করছে।

কলকল শব্দে শ্রীমতী হেসে উঠলেন। মা'র এমন হাসি সে আর শোনেনি। কি অদ্ভুত হাসি, শুনলেই গা শিরশির করে ওঠে।

মা'র হাসি শুনে গা শিরশির করে উঠলেও এই ভেবে এডগার স্বস্তি পায় যে আপাতত মা'র ভয়ের কিছু নেই। এখনও কোন বিপদে পড়েনি, বিপদে পড়লে কখনো এভাবে প্রাণ খুলে কেউ হাসতে পারে? তাছাড়া, খুব গুরুতর কোন কাজও নিশ্চয় এখন ওরা করছে না, নইলে দুজনেই এমন হাসিখুশি কেন?

কিন্তু, গুরুতরই যদি কিছু না করবে তবে এত লুকোচুরির দরকারটাই বা কি? অ্যাঁ! এযে ভারী গোলমেলে কাণ্ড হল!

এডগার খানিকটা হতাশ হয়। কত কি সে ভেবেছিল, এখন দেখে সব ফক্কি। মিছেই কি সে তবে এত হই-হুজ্জোত করল!

কিন্তু, এত রাতে ওরা যায় কোথায়? বাগানে ঝিরঝিরে হাওয়া হলে কি হবে, আকাশপুরীতে এখন বোধ হয় ভীষণ ঝড় উঠেছে, তাই মেঘগুলো আকাশময় অমন ছটফট করছে। একেকবার একেকজন এগিয়ে এসে ঢেকে ফেলেছে চাঁদকে, বাগান অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু চাঁদকে ঢেকে রাখা তো ওই ছোট্ট ছোট্ট মেঘগুলির সাধ্যি নয় — একটু পরেই চাঁদটা আবার টুক করে বেরিয়ে পড়ছে, চাঁদের আলোয় ফের ঝলমলিয়ে উঠছে চারদিক। কী অবাক কাণ্ড — আশ্চর্য এই আলো-ছায়ার খেলা! এই ছাখো গাছের পাতারা ঝকমক করছে, একটু বাদেই আবার সব অন্ধকারে একাকার।

খানিক অন্ধকারের পর আবার চাঁদ উঁকি দিল, ঝলমলিয়ে উঠল চারদিক — এডগার দেখল দূরে দুটি ছায়ামূর্তি। না, দুটি না—একটি।

আসলে অবিশ্যি দুটিই, কিন্তু এমন জড়াজড়ি করে চলেছে যে দূর থেকে মনে হয় একটি। ঝোপের দিকে চলেছে দুজনে। কেন? অঁ্যা, কেন? ওই অন্ধকার ঝোপের দিকে ওরা যায় কেন?

উঁহু, ব্যাপার বড় সুবিধের নয়। আপন মনে বিড় বিড় করে এডগার — ফলো করতে হচ্ছে। এই রাত্তিরবেলা অন্ধকার ঝোপের মধ্যে ওদের দরকারটা কি?

গাছের আড়ালে-আড়ালে ছায়ায় ছায়ায় এডগার এগোতে থাকে — ঝানু গোয়েন্দার মত। শত্রুপক্ষ কি বলাবলি করছে বাতাসের শব্দে শোনা যায় না। তা না যাক শোনা, কিন্তু ওদের মতলবটা কি জানা দরকার, ওরা কি করে দেখতে হয়। কি এমন গোপন ব্যাপার, কেন ওরা এমন লুকোচুরি খেলছে — জানতেই হবে তা। ইশ, ওদের একটা কথাও যদি শোনা যেত!

ওদিকে শ্রীমতী কিন্তু ভাবতেও পারেননি যে পেছনে তাঁদের গোয়েন্দা লেগেছে — সঙ্গীর শরীরে নিজেকে সঁপে দিয়ে তিনি এগোন। পরস্পরকে একান্ত করে পেয়ে দুজনের মনই এখন কানায় কানায় ভরে উঠেছে — সমাজসংসার মিছে সব, সত্যি শুধু তাঁরা দুজন আর তাঁদের চারপাশের এই মায়াবী পরিবেশ। পরস্পরকে পুরোপুরী করে পাবার জোরালো কামনায় উদ্বেল হয়ে উঠেছে দুটি দেহ-মন।

কি করে এখন ওরা টের পাবে যে ওদের প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি পদক্ষেপ ওদের অনুসরণ করছে — ঘৃণা ও কৌতূহলে জ্বলন্ত একজোড়া চোখ অন্ধকারে নির্ণিমেষ ওদেরই দিকে!

হঠাৎ পথের মাঝখানেই দুজনে থেমে পড়ল।

আর এডগার সঙ্গে সঙ্গে একটা গাছের আড়ালে টুক করে সরে যায়। তাকিয়ে থাকে দুই চোখ বড় বড় করে।

··· ধরো, হঠাৎ যদি ওরা পিছনে ফেরে? তারপর ঘরে গিয়ে মা যদি আমায় না দেখতে পায়? তখন তো নির্ঘাৎ সন্দেহ করবে যে আমি ওদের ফলো করেছিলুম। তাহলে? তাহলে এর পরে এমন সেয়ানা হয়ে যাবে যে ওদের গোপন ব্যাপারটা আমি আর ধরতেই পারব না। তা যদি হয় ······

মেঘে চাঁদ ঢাকা পড়েছিল, আবার বেরিয়ে এল।

হঠাৎ এডগার দেখে কি, লোকটা মা'কে ভুলিয়ে-ভালিয়ে অন্ধকার ঝোপের মধ্যে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে। একটু-একটু জোর-জবরদস্তিও করছে। মা যেন বলল 'না না', কিন্তু লোকটা নাছোড়বান্দা। কেমন করছে ত্যাখ, মা'কে ধরে কী টানাটানি লাগিয়েছে! কেন? মতলবখানা কি ওর? মা'র কাছ থেকে চায় কি? ··· অনেক বই পড়েছে এডগার — 'অন্ধকারে গুম খুন', 'ছেলেধরার খপ্পরে' ইত্যাদি খুন জখম চুরি ডাকাতি রাহাজানির কত বই তার পড়া। মাকে খুন করাই লোকটার মতলব নাকি? তা-ই ও মাকে একা-একা পেতে চাইছিল! তাই মা'কে দিয়ে তাকে ঘরে আটকে রেখে রাত্তিরবেলা মা'কে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিরিবিলি এখানে নিয়ে এসেছে? ওরে বাব্‌বা! এযে ভীষণ ব্যাপার! চিৎকার করে লোকজন ডাকবে? 'খুন' 'খুন' বলে চেঁচিয়ে উঠবে?

এডগার, চেঁচিয়েই উঠতে যায় কিন্তু উত্তেজনায় যে দম বন্ধ হয়ে

আসছে, চেঁচাবে কি! হাত-পা ঠকঠক করে, হাঁটুতে হাঁটুতে ঠোকাঠুকি লাগে।

মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি একটা গাছের ডাল ধরে নিজেকে সামলে নেয়। মর্‌মর্ শব্দে ডালটা ভেঙে পড়ে।

দুজনে এই শব্দে চমকে যায়, পিছন দিকে তাকায়।

এডগার কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, নিশ্বাস নেবার সাহস পর্যন্ত হয় না। নিঃসীম স্তব্ধতা বাগানে। বাতাস পর্যন্ত স্থির-স্তব্ধ।

শ্রীমতীই আগে মুখ খুললেন, 'চলো, ফেরা যাক।' তাঁর স্বর ভয়ার্ত। ভীত খানিকটা স্টার্ণফেল্ডও। সেও সঙ্গে সঙ্গে সায় দেয়।

জড়াজড়ি করে আস্তে আস্তে ওরা পা বাড়ায়। কি-এক ভাবনায় তন্ময় দুজনেই।

আর ওদের এই তন্ময়তার সুযোগে উবু হয়ে এডগার দৌড় মারে। একেবারে হোটেলের ভেতরে এসে দম ছাড়ে। তাড়াতাড়ি শিকল খুলে নিজের ঘরে গিয়ে ঢোকে। তারপর কোনমতে জামাটা ছেড়ে ফেলে বিছানায় শুয়ে পড়ে। কয়েক মুহূর্ত চিৎ হয়ে ঝিম মেরে পড়ে থাকে।

কিন্তু শুয়েও কি সোয়াস্তি আছে!

একটু পরেই আবার ওঠে, জানালার কাছে গিয়ে ফের বাগানের দিকে উঁকি মারে। ওরা আসছে, ওই দেখা যায় ওদের ছায়া — জোৎস্নায় ভূতের মত দেখাচ্ছে দুজনকে।

...স্টার্ণফেল্ড কি তাহলে ছদ্মবেশী খুনে — হত্যাকারী? মা'কে কি খুন করবার মতলব ছিল তার? ভাগ্যিস সে গাছের

ডালটা ভেঙে ফেলেছিল, তাই না ব্যাটার মতলব বানচাল হয়ে গেল।

মা'র মুখখানি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কী খারাপ দেখাচ্ছে মা'র মুখটা — ভীষণ যেন ভয় পেয়ে গেছে, মুখখানি তাই বড় করুণ হয়ে উঠেছে। কিন্তু লোকটাকে দ্যাখ অন্যরকম। নিজের মতলব ফেঁসে যাওয়ায় ভয়ানক হতাশ যেন।

হোটেলের কাছাকাছি হতে দুজনে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল।···জানালার দিকে তাকিয়ে আমাকে দেখতে পেয়েছে নাকি? উঁহু, আমার কথা এতক্ষণ ভুলেই গেছে ওরা।···কিন্তু, জেনে রাখ, আমি তোমাদের ভুলিনি। তোমরা ভাবছ আমি ঘুমিয়ে আছি, কিম্বা এডগার বলে কেউ নেই পৃথিবীতে — দাঁড়াও না, ঠিক সময় তোমাদের ভুল আমি ভেঙে দেব। যতক্ষণ না সেই গোপন ব্যাপারটা জানতে পারছি, কিছুতেই তোমাদের রেহাই দেব না। সব সময় তোমাদের পিছনে ছায়ার মত লেগে থাকব।······

খিড়কির দরজার কাছে এসে দাঁড়াল দুজনে। দুটি ছায়া আবার এক হয়ে গেল।

এক হয়ে রইল!

এগারো

দম বন্ধ করে এডগার জানালার কাছ থেকে সরে আসে।

ভয়ে সারা শরীর তার সিঁটিয়ে আসছে। ধাঁধাটাকে যেন সে অনেকখানি বুঝে ফেলেছে। খুন-জখম জাল-জুয়াচুরীর কত সব রোমাঞ্চকর কাহিনী সে শুনেছে, বইয়ে পড়েছে। এতদিন শুধু সেগুলিকে অবাস্তর কথা-কাহিনী বলে মনে হত। কিন্তু, অবাস্তব কিছুই নয়, তার নিজের চোখের সামনেই যখন ঘটতে আরম্ভ হয়েছে সেই সব ঘটনা। আর শোনা-কথা বা পড়া-কহিনী না, সবকিছু এখন চাক্ষুষ সে দেখতে পাচ্ছে। মস্ত বড় একটা রহস্যের দরজা যেন খুলে গেল চোখের সামনে, ভয়ে আর খুশিতে একই সঙ্গে এডগারের মন উপছে ওঠে।···অবাক কাণ্ড, এই লোকটাই আমার সঙ্গে বন্ধুতা পাতিয়েছিল! লোকটা কি তাহলে সত্যিই খুনে? খুনেই যদি না হবে, তবে কেন ও মা'কে অন্ধকার ঝোপের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল?

ভীষণ ষড়যন্ত্র, ভয়ানক একটা বিপদের বেড়াজাল চারদিকে — কিন্তু এ অবস্থায় কি যে করা উচিত, এডগার ভেবে-ভেবেও কূল পায় না। তবে

একটা ব্যাপার সে ঠিক করে ফেলেছে — কালই বাপিকে একটা চিঠি লিখে দেবে, কিম্বা টেলিগ্রামই করে দেবে।

কিন্তু কালের কথা কাল, এর মধ্যে যদি কিছু হয়ে যায়? আজ রাতেই যে মা'র কোন বিপদাপদ ঘটবে না কে বলতে পারে? মা তো এখনও তার ঘরে ঢোকেনি, নির্ঘাৎ বদমাসটা ওকে আটকে রেখেছে।

দরজা না খুলে, দরজার কিনারে কান পেতে দাঁড়াল এডগার। সামনে বারান্দা, তার ওপাশে মা'র ঘর। এই বারান্দা দিয়েই মা'কে আসতে হবে।

খানিক পরে দুজনের পায়ের শব্দ শোনা যায়। ওরা কি বলে শোনবার জন্যে এডগার কান খাড়া করে থাকে।

ইশ, কি আস্তে আস্তে আসছে ছাখ, যেন পাহাড় বেয়ে উঠছে। বাগানে একটু ঘোরাঘুরিই করেই যেন ভয়ানক ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। দু'পা এগোয় আর থামে, ফিসফিস করে কি বলাবলি করে।

ভয়ে উত্তেজনায় এডগারের বুক দুরদুর করে ওঠে। কি বলছে ওরা, অ্যাঁ, কি বলাবলি করছে নিজেদের মধ্যে? হে ভগবান, একবার যদি ওদের কথাগুলো শুনতে পেত! আর কিছু সে, চায় না শুধু জানতে চায় কি সেই গোপন কথা বারবার ফিসফিস করে ওরা যা বলাবলি করছে! হে ভগবান!

বোঝা যায়, আস্তে আস্তে ওরা এগিয়ে আসছে। অনেক কাছে এসে পড়েছে। এডগার এবার স্পষ্ট শুনতে পায়, একটু আগেই কি যেন বলেছে লোকটা, জবাবে এখন মা বলছে—

'না গো, আজ থাক—উঁহুঁ। না!'

এডগার চমকে ওঠে। ওরা এক-এক পা বাড়ায় আর বুকের গুড়গুড়ানি ওর দমকে দমকে যায় বেড়ে।

লোকটা কাকুতি-মিনতি করে, 'দোহাই তোমার, লক্ষ্মিটি! না বলো না। আমি ব'লে সন্ধ্যে থেকে—'

মা যেন ভয় পেয়ে যায়। তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলে, 'না গো—ভয় করে! না না, আজ ছেড়ে দাও, তোমার পায়ে পড়ি—আজ রাত্তিরে না। আজ ছেড়ে দাও।'

কি চায় লোকটা? কি চাইছে ও মার কাছে? এডগার, অবাক হয়ে ভাবে, মা-ই বা এত ভয় পায় কেন? অ্যাঁ?

একেবারে দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ওদের কথা এখন আরো স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

'এসো। ঘরে চলো, আমার ঘরে—লক্ষ্মিমণি।'

মা সশব্দে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। আর যেন প্রতিবাদের শক্তি নেই।

কি ব্যাপার? মাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে কি করবে ও? মতলব কি? এডগার ভ্যাবাচাকা খেয়ে যায়।

শ্রীমতী নিজের ঘরে ঢুকলেন না, স্টার্ণফেল্ডের সঙ্গে সঙ্গে বারান্দা দিয়ে এগিয়ে গেলেন — এডগার বুঝতে পারে। দুজনেই এখন চুপ।

কিন্তু কেন? হঠাৎ এভাবে ওরা চুপ করে গেল কেন? তবে কি বদমাসটা এবার মায়ের গলা টিপে ধরেছে, কিম্বা রুমাল-টুমাল কিছু গুঁজে দিয়েছে মুখের মধ্যে? মা তো 'না না' করছিলই, পাছে চেঁচিয়ে ওঠে, তাই কি লোকটা……

ভীষণ আতঙ্কে অভিভূত হয়ে গিয়ে এডগার তাড়াতাড়ি দরজা খুলে ফেলল। ক্যাঁচ করে শব্দ হল একটু—তা হোক—ওদের এখন স্পষ্ট দেখা যাবে।

দেখে কি, এক হাতে মা'র কোমর জড়িয়ে ধরেছে লোকটা, মিষ্টি-মিষ্টি স্বরে কি যেন বলছে। ভোলাচ্ছে! ভুলিয়ে-ভালিয়ে ঘরে নিয়ে ঢোকাবার মতলব!

কিন্তু, মা'ও যেন কেমন এলিয়ে পড়েছে। কই, আগের মত আর তো না না করছে না? লোকটার গায়ে ভর দিয়ে দিব্যি এগিয়ে চলেছে!

স্টার্ণফেল্ডের ঘরের দরজার সামনে গিয়ে দুজনে একবার দাঁড়াল।

এইবার—এইবার নির্ঘাৎ একটা ভয়ানক কাণ্ড হবে।···এডগার সোজা হয়ে দাঁড়ায়, এতদিন ধরে পড়া রোমাঞ্চকর গল্প-উপন্যাসের প্লটগুলো একসঙ্গে তার মনের মধ্যে হানা দিয়ে যায়।

চকিতে ঘর থেকে সে বেরিয়ে আসে। আস্তে আস্তে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে পিছন থেকে বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে ওদের ওপর।

হঠাৎ হামলায় চমকে গিয়ে শ্রীমতী ছিটকে যান। মাথা ঘুরে পড়েই যাচ্ছিলেন, তাড়াতাড়ি স্টার্ণফেল্ড তাঁকে ধরে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে সে-ও অনুভব করে, দুটি কচি হাতের ঘুঁষি দমাদ্দম তার মুখে এসে পড়ছে, বিড়ালের মত নখ দিয়ে কেউ তাকে আঁচড়াচ্ছে কামড়াচ্ছে। উদ্ব্যস্ত করে তুলছে।

কোনদিকে তাকাবার ফুরসৎ নেই, শ্রীমতী দ্রুত গোড়ালি উঁচু করলেন। স্টার্ণফেল্ডও কিছু বোঝবার আগেই পাল্টা ঘুঁষি চালাতে শুরু করে।

এডগার আগেই জানত যে অমন একটা ষণ্ডাগুণ্ডা লোকের সঙ্গে সামনা-সামনি লড়াই করে জিততে পারবে না। না পারুক জিততে, কিন্তু সে যে কত ঘৃণা করে ওকে তাতো ব্যাটা বুঝতে পারবে। রাগে দাঁত কিড়মিড় করতে করতে সে ঘুষি চালায় প্রাণপণ।

ওদিকে স্টার্ণফেল্ড এতক্ষণে টের পেয়েছে গোয়েন্দাটি কে। এই হারামজাদা বিচ্চু শয়তানটা সব কিছু ভেস্তে দিল—রাগে তার মাথায় আগুন জ্বলে যায়। সে-ও কষে চড় লাগায়—চড়, থাপ্পড়।

মার খেয়েও এডগার চেঁচায় না কাঁদে না, সে-ও সামনে হাত-পা ছোঁড়ে।

বেশ কয়েক মিনিট ধরে অন্ধকার বারান্দায় চলে এই অসম লড়াই।

শেষ পর্যন্ত স্টার্ণফেল্ডই আগে সচেতন হয়ে উঠল। ছি ছি, একি করছে সে! সামান্য একটা বাচ্চার সঙ্গে সে ঘুষোঘুষি — লোকে দেখলে ভাববে কি! এডগারের হাত দুটো সে খপ করে ধরে ফেলল।

এডগার বুঝল, এবার অসম্ভব। আর পেরে ওঠা যাবে না গুণ্ডাটার সঙ্গে। কিন্তু তবু, শেষ চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি। মরীয়া হয়ে সে স্টার্ণফেল্ডের ডান হাতটা কামড়ে ধরল।

চাপা আর্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে হাতের মুঠো আলগা করে স্টার্ণফেল্ড, আর এই ফাঁকে ছিটকে বেরিয়ে যায় এডগার। একেবারে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকে দরজায় খিল তুলে দেয়।

হোটেলের সকলে তখন ঘুমে অচেতন। মাঝরাত্তিরের এই লড়াইয়ের

কথা জানল না কেউ। সারা হোটেলে যেন নেমে এসেছে কবরের শান্তি।

রুমাল বের করে হাত থেকে রক্তের দাগ মুছে ফেলল স্টার্ণফেল্ড। অন্ধকার বারান্দার দিকে তাকাল একবার।

না, কেউ কোথাও নেই।

কিন্তু, সত্যিই কি নেই? তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের তরঙ্গ তুলে কে যেন নীরবে হাসছে না?

বারো

কাল রাতভোর কি আমি কেবলি স্বপ্ন দেখেছি — দুঃস্বপ্ন ? পরদিন সকালে উঠে এডগার নিজেকে প্রশ্ন করে।

ভয়ানক মাথা ধরেছে। জামাকাপড় না ছেড়েই শুয়ে পড়েছিল নাকি ? নিজের দিকে তাকিয়ে সে অবাক হয়ে যায়। তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নেমে আয়নার সামনে দাঁড়ায়। কি বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে মুখটা. উস্কোখুস্কো চুল, ফুলোফুলো মুখ, কপালের ওপর মস্ত বড় একটা কালশিরা। ...... অঁ্যা, একি চেহারা হয়েছে আমার।......

বেশ খানিকক্ষণ ভাবার পর তার কথা, মনে পড়ল সব গত রাত্তিরের সব ঘটনা। হঁ্যা, কাল হয়ে গেছে তার দুষমণের সঙ্গে এক হাত — মাঝরাত্তিরে, ওই অন্ধকার বারান্দায়। মনে পড়ছে, একে একে সব এখন মনে পড়ছে — শেষকালে সে পালিয়ে এসেছিল, ভীষণ ভাবে হাঁপাচ্ছিল, জামাকাপড় বদলাবার শক্তিও ছিল না — সটান বিছানায় এসে গা এলিয়ে দিয়েছিল।

তারপর — ঘুম — না, ঠিক ঘুম নয় — স্বপ্ন — রাতভোর স্বপ্ন দেখেছে —বিকট ভয়ানক সব স্বপ্ন।

জানালার নিচে বাগানে কারা যেন পায়চারী করছে। এখান থেকেই তাদের কথাবার্তার শব্দ শোনা যায় — অস্পষ্ট। সূর্য আকাশে অনেকখানি উঠে এসেছে, বেশ বেলা হয়ে গেছে। ঘড়ির দিকে তাকায় এডগার — বন্ধ হয়ে আছে ঘড়িটা। কাল সারা দিনের হই-হট্টগোলে ঘড়িতে দম দেওয়ার কথা মনেও হয়নি।

কি ভেবে, তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে এডগার উঠে পড়ল। চোখমুখ ধুয়ে পোশাক বদলে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল।

কেমন যেন ভয়-ভয় করছে, বিতিকিচ্ছিরি লাগছে।

নিচে নেমে দেখে, খাবারঘরে মা চুপচাপ বসে — সামনে জলখাবার। সেই গুণ্ডাটা? না, সেটা নেই। বাঁচা গেল বাবা! স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ে এডগার। তবু, মা'র মুখের দিকে তাকিয়ে খানিকটা দমে যায়। পা টিপে টিপে এগোয়।

'মা-মণি!'

শ্রীমতী জবাব দিলেন না। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিলেন, তাকিয়েই রইলেন।

গম্ভীর মুখ মা'র, চোখের কোলে কালির দাগ, থেকে থেকে ফুলে উঠছে নাকের বাঁশি। দেখে-শুনে এডগার বুঝল, মা কী ভীষণ রেগে গেছে।

ধাঁধা লেগে যায় তার। সে-ই যে কাল রাত্তিরে লোকটাকে ধরে উত্তম-মধ্যম দিয়েছে, মা-মণি তা জেনে গেছে নাকি? তার পিটুনি খেয়ে

ব্যাটা সাবাড় হয়ে যায়নি তো? অ্যাঁ, খবর কি লোকটার, গেল কোথায়? আড়চোখে সে মা'র মুখের দিকে তাকায়, অপলক অন্যদিকে চেয়ে আছে মা। একবার ভাবে সরে পড়ে এখান থেকে। কিন্তু, হঠাৎ যদি মা ফিরে তাকায়, চোখাচোখি হয়ে যায়? সর্বনাশ!

ঘাড় গুঁজে এডগার কফির কাপে চুমুক দেয়। নিঃশব্দে খেয়ে চলে। প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করে, এই বুঝি এক কেলেঙ্কারী হয়।

চুপচাপ কেটে গেল মিনিট পনের, শ্রীমতী একটি কথাও বললেন না। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন, কোনদিকে দৃকপাত না করে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

এডগার এখন কি করে? বসেই থাকবে, না যাবে মা'র পিছন পিছন?

এখানে বসে থেকেই বা কি লাভ? মা'র এরকম হেনেস্থা একেবারে অসহ্য। তার চেয়ে মা'র কাছে যাওয়াই ভালো, কপালে যা আছে হবে। এডগার উঠে দাঁড়াল।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে মা'র ঘরের সামনে এসে দেখে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ।

গত রাতের বীরপুরুষটি এখন একেবারে অসহায় হয়ে পড়ে। কি করবে এবার? কি করা উচিত? হয়ত লোকটাকে শিক্ষা দেবার সময় একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। তাই কি ওরা দুজনে নতুন করে তাকে ফের অপমান করবার মতলব ভাঁজছে? নিশ্চয় তাই, নির্ঘাৎ। ওর বিরুদ্ধে নতুন ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে ওরা।

সারা সকাল এডগারের মনটা বড় ভার-ভার হয়ে থাকে।

দুপুরে খাবার সময় ফের দেখা হল মার সঙ্গে। তেমনি গম্ভীর মুখ, তেমনি চুপচাপ।

'মা-মণি!'

শ্রীমতী একবার ফিরে তাকান, জবাব দেন না।

এডগার বুঝতে পারে সত্যি সত্যি মা বড্ড রেগে গেছে — এত রেগেছে যে তার ডাকে সাড়া পর্যন্ত দিচ্ছে না। মা অবিশ্যি এমনিতে একটু রাগী মানুষ — কিন্তু তার এমন রাগ সে জন্মে দেখেনি।

এবার সত্যি সত্যি ভয় পায় এডগার। এর চেয়ে মা যদি তাকে খুব বকাবকি করত, ধরে দুচার ঘা লাগিয়েও দিত — সেও ছিল অনেক ভালো। বকাবকি মারধোরের পর মা'ই আবার আদর করে বুকে টেনে নিত। সে রাগ হল বাইরের রাগ। কিন্তু এ একেবারে ভেতরে ভেতরে রাগ। মা'র মুখের দিকে তাকাতেই এখন বুক কেঁপে ওঠে।

কোন মতে এডগার খাবারের গ্রাস মুখে তোলে। চিবুনের সাধ্যি নেই, গলা শুকিয়ে কাঠ — ভালো ভাবে গিলতেও পারে না।

খাওয়া শেষ হলে শ্রীমতী উঠে দাঁড়ালেন।

'আমার ঘরে একবার এসো। তোমার সাথে কথা আছে।'

মা'র স্বর শুনে ধড়ে প্রাণ আসে এডগারের — না, তেমন রাগী-রাগী মনে হল না তো। কিন্তু ও কি কথার ধরণ — অমন করে ছেলের সঙ্গে মা নাকি কথা বলে?

মাথা নিচু করে মা'র পিছু পিছু এডগার ঘরে এসে ঢুকল।

চুপচাপ কেটে গেল খানিকক্ষণ।

বাগানে ছেলেরা খেলছে — তাদের হুটোপাটির শব্দ শোনা যাচ্ছে। এদিকে এডগারের দম বন্ধ হয়ে আসে, বুক দুরদুর।

শ্রীমতীও কিছুটা অস্বস্তিবোধ করেন। কি ভাবে কথা শুরু করবেন প্রথমে ভেবে পান না, তারপর ছেলের দিকে না তাকিয়েই বলতে থাকেন।—

'তোমার সম্বন্ধে আমার ধারণা যে কি হয়েছে তা আর বলে কাজ নেই। তোমার কথা ভাবলেও ভয় হয় — ছি-ছি! থাকগে, এর ফল তুমি পাবে। ভদ্দরলোকের সাথে তুমি মেশবার যোগ্য নও —' এক নাগাড়ে তিনি বলে যান — 'তোমার বাবাকে আমি সব লিখে দিয়েছি — স-ব কথা — তোমাকে কড়া শাসনে রাখা দরকার। হয় তিনি তোমার জন্যে একজন মাস্টার রেখে দিন, নয় কোন বোর্ডিং-এ পাঠাবার ব্যবস্থা করুন, — নইলে তুমি শায়েস্তা হবে না! তোমায় ঝক্কি পোয়াতে আমি আর পারব না।'

এডগার মাথা হেঁট করে থাকে, এই তো সবে শুরু, কে জানে এরপর কপালে কি আছে!

'হ্যাঁ, ভালো কথা, তোমাকে ওই ভদ্দরলোকের কাছে মাপ চাইতে হবে — বুঝলে?'

এডগার নড়ে-চড়ে ওঠে, তাকে কিছু বলবার অবসর না দিয়ে শ্রীমতী পুনশ্চ বলেন, 'উনি আজ সকালেই হোটেল ছেড়ে চলে গেছেন। এখন আমি যা বলি তাই ওঁকে লিখে দাও।'

কি যেন বলতে চায় এডগার, আবার বাধা আসে।

'উঁহু, তোমার কোন কথা আমি শুনতে চাইনে। বোসো। ওই

টেবিল থেকে প্যাড আর কলমটা টেনে নাও।'

মা'র দিকে তাকায় এডগার। একদৃষ্টিতে মা-ও তাকিয়ে।

সে-চোখের দিকে তাকালেই রক্ত জল হয়ে যায়।

বিন্দুমাত্র প্রতিবাদের সাহস তার হয় না। মা'র কথামত টেবিল থেকে চিঠির প্যাড আর কলমটা টেনে নেয়। কলম ধরে প্যাডের ওপর ঘাড় গুঁজে থাকে।

'আগে তারিখ দাও। দিয়েছ? এক লাইন ছেড়ে দাও। বেশ। এবার শুরু কর — "প্রিয় ব্যারন ভন স্টার্ণফেল্ড" — কমা, আবার এক লাইন ছেড়ে দাও — আচ্ছা, একটু ডান দিক থেকে আরম্ভ কর, লেখ — "আপনি হোটেল ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন শুনিয়া" — শুনিয়া দন্ত্য-স নয়, তালব্য-শ — "শুনিয়া আমি খুবই দুঃখিত হইয়াছি।" লিখেছ? আচ্ছা, দাঁড়ি। এরপর লেখ — "যাওয়ার সময় আপনার সহিত দেখা হইল না বলিয়া এই চিঠি লিখিতেছি" — তাড়াতাড়ি লেখ, হাতের লেখা খারাপ হলে কিছু হবে না। লেখ — "কাল রাত্রির ঘটনার জন্য আমি ক্ষমা চাহিতেছি। মা হয়ত আপনাকে বলিয়াছেন যে অনেক দিন অসুখে ভুগিয়া আমার মন-মেজাজ খারাপ হইয়া গিয়াছে, অনেক সময় না জানিয়া অনেক অন্যায় করিয়া ফেলি। পরে সেজন্য আমার আফসোসের আর সীমা থাকেনা" ... ...

কলম বন্ধ করে এডগার সোজা হয়ে বসল।

'না, এ আমি লিখব না — মিথ্যে কথা!'

'এডি!'

'মিথ্যে কথা — এ-সব মিথ্যে কথা! কোন দোষ করিনি, কেন

তবে আফসোস করব? কেন লোকের কাছে মাপ চাইব? আমি শুধু তোমায় সাহায্য করবার জন্যে এগিয়ে গিয়েছিলুম, তুমিই তো সাহায্য চাইছিলে —'

শ্রীমতী হাঁ হয়ে গেলেন।

'আমি সাহায্য চাইছিলুম? তোর কি মাথা খারাপ!'

'হ্যাঁ, চেয়েছিলেই তো। কাল রাত্তিরে ওই বারান্দায় লোকটা যখন তোমায় জাপটে ধরেছিল, তুমি বলোনি — আমায় ছেড়ে দাও, লক্ষিটি আমায় ছেড়ে দাও — বলোনি তুমি? এত জোরে বলছিলে যে ঘর থেকেই আমি স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিলুম। তাইনা —'

'মিথ্যেবাদী! তুই একটা আস্ত গাধা। ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে কাল রাতে আমার দেখাই হয়নি।'

এডগার স্তম্ভিত। অ্যাঁ! এ কী ডাহা মিথ্যে! ওই গুণ্ডাটার সঙ্গে কাল রাতে মা'র দেখাই হয়নি? মা বলছে এই কথা!

দুই চোখ বিস্ফারিত করে মা'র মুখের দিকে সে তাকিয়ে থাকে।

'তুমি … তুমি …বারান্দায় ছিলে না? আর … আর … ওই লোকটা … লোকটা তোমায় জাপটে ধরেনি? জোর করে ও তোমার … তোমায় …'

শ্রীমতী সশব্দে হেসে ওঠেন। নিষ্প্রাণ কর্কশ হাসি।

'জেগে জেগে তুই স্বপ্ন দেখছিস, খোকা!'

এবার এডগারের আর সহ্য হয় না। বড়রা হর্দম মিথ্যে কথা বলে, সকলেই জানে, কিন্তু মা-মণি যে তার মুখের ওপর এমন একটা জলজ্যান্ত মিথ্যে বলে বসবে সে ভাবতেও পারেনি।

'আমার কপালের ওপর এই-যে কালশিরে পড়ে গেছে — এটাও তাহলে স্বপ্নে হয়েছে — বলো ?'

'কোথায় বাঁদরামি করতে গিয়েছিলে, কে ধরে দু'ঘা দিয়েছে — আমি তার কি জানি! যাক, বাজে কথা বাদ দিয়ে বোস এখন, যা বলি চটপট লিখে যাও —'

শ্রীমতীর মুখখানি ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে, অনেক কষ্টে নিজেকে তিনি সংযত রাখেন।

কিন্তু মেজাজ একেবারে বিগড়ে যায় এডগারের। বড়দের আর বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই। মুখের ওপর কেমন বেপরোয়া মিথ্যে বলে — একেবারে আটকায় না? আশ্চর্য! অবাক কাণ্ড! ওরা আবার চায় ছোটরা ওদের শ্রদ্ধাভক্তি করুক? ছ্যাঃ ছ্যাঃ — মানুষ না — বড়রা মানুষ না! তীব্র ঘৃণায় বিদ্বেষে মন তার টগবগিয়ে ওঠে।

দাঁতে দাঁত চেপে বলে, 'হুঁ, আমি স্বপ্ন দেখেছি, না মা — সব স্বপ্ন? সিঁড়িতে যা হয়েছিল স্বপ্ন, আমার কপালের এই কালশিরেও স্বপ্ন! রাত্তিরে ওই লোকটার সাথে যে বাগানে তুমি বেড়াচ্ছিলে— সেও স্বপ্ন! ও যে তোমায় অন্ধকার ঝোপের মধ্যে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল — তাও স্বপ্ন! স্বপ্ন — সব স্বপ্ন — সব মিথ্যে, না? কিন্তু তুমি আমায় যত বোকা ভাব অত বোকা আমি নই মা, অত বোকা আমি নই। সব বুঝি, স-ব আমি বুঝি।'

আগুনজ্বালা চোখে সে মা'র মুখের দিকে তাকায়, নত হয়ে আসে মা'র মুখ।

নিজের সন্তানের মুখোমুখি তাকাবারো সাহস নেই শক্তি নেই।
কয়েক মুহূর্তের স্তব্ধতা।
কি যেন ফের বলতে যাচ্ছিল এডগার, শ্রীমতী রাগে ফেটে পড়েন, 'থামো! ভালো চাও তো যা বলি লিখে যাও, নইলে —'
'নইলে কি?' এডগারো মুখিয়ে ওঠে।
'নইলে — নইলে চাবকে তোমায় আমি শায়েস্তা করব।'
এডগার উঠে দাঁড়ায়, মা'র গা ঘেঁষে আসে, তিক্ত হেসে বলে, 'বেশ, চাবকাও!'
ভয় দেখাবার জন্যেই হাত তুলেছিলেন শ্রীমতী, এডগারের চ্যালেঞ্জে ঠাস করে এক চড় মেরে বসলেন।
ক্রোধে বিস্ময়ে চাপা আর্তনাদ করে উঠল এডগার। তারপর মরীয়া হয়ে গিয়ে চোখমুখ বুজে সে-ও চালাল ঘুষি। ঘুষির পর ঘুষি। বুকে, মুখে — শ্রীমতী চেঁচিয়ে উঠলেন।
আর মার চিৎকার শোনার সঙ্গে সঙ্গে হুঁশ হল এডগারের। একি— একি করল সে! মা'র গায়ে হাত তুলল? মাকে মারল! হে ভগবান! ছি ছি ছি!
দেয়ালে তার মাথা ঠুকে মরতে ইচ্ছে করে!— ছি ছি। কি করে মা-মণিকে সে মুখ দেখাবে! লোকে শুনলে কি ভাববে! ছি ছি ছি — দরজা দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে যায় এডগার, তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নামে, এক দৌড়ে হল ঘর পেরোয়—সোজা ছুটতে থাকে যেদিকে দুচোখ যায়।
একদল পাগলা কুকুর যেন এডগারকে তাড়া করেছে।

তেরো

অবশেষে একসময় থামল এডগার।

হাত-পা সর্বশরীর কাঁপছে থরথরিয়ে। একটা গাছে হেলান দিয়ে নিজেকে সে সামলে নেয় হাঁফ ধরে গেছে।

এখন? এখন কি করবে? কোথায় যাবে?

এখানে আর থাকা অসম্ভব। কিন্তু যাবেই বা কোথায়? পৃথিবীর কিছুই যে সে চেনে না, কিছুই জানে না। অসহায়ের মত চারপাশে তাকাতে থাকে — নির্জন চারদিক। সব কিছু অজানা, অপরিচিত।

বাবা? বাবার কাছে ভিয়েনায় চলে যাবে?

ওরে বাব্‌বা, যা রাগী মানুষ! দুই থাপ্পড় কষিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ফের এখানে মা'র কাছেই পঠিয়ে দেবেন। বাবার কথা ভাবাও যায় না। তার চেয়ে, যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাব। হ্যাঁ, তাই ভালো। মা'র কাছে আর কোন দিন সে মুখ তুলে তাকাতে পারবে না। এ মুখ আর মা'কে দেখাতে পারবে না! মা, মা-মণি—!

আচ্ছা, ঠাকমার কাছে গেলে কেমন হয় ?

ভারী ভালো মানুষ ঠাকমা, কত ভালোবাসেন তাকে। ঠাকমা কাছে থাকলে কেউ তাকে বকতে পারে না, তার গায়ে হাত তোলা তো দূরের কথা। হ্যাঁ, এক কাজ হতে পারে, — মা বাবার রাগ না পড়া পর্যন্ত ঠাকমার কাছে গিয়ে থাকা যায়। ঠাকমা তাকে আদর করে রাখবেন। তারপর ঠাকমার ওখান থেকে মা বাবার কাছে একটা চিঠি লিখে দেবে — চিঠিতে নিজের সব অপরাধ স্বীকার করে মাপ চেয়ে নেবে। অ্যাঁ? নিজের মনকেই এডগার প্রশ্ন করে — তাই ভালো, না ?

কালও নিজের সম্পর্কে এডগারের বড় গর্ব ছিল — সব সে জানে, সব বোঝে। এখন কিন্তু নিজেকে তার শিশুর মত অসহায় মনে হয়। হায়রে, সে যদি আগের মত ছোট্টটিই থাকত! আর বুঝি ছোট হওয়া যায় না!

ঠাকমা থাকেন ব্যাডেনে। কি করে যেতে হয় সেখানে — কোন দিকে ব্যাডেন ?

চিন্তিত মনে পকেট থেকে নিজের ছোট্ট মনিব্যাগটি সে বের করল। চব্বিশ ঘণ্টার সাথী এই মনিব্যাগটা। জন্মদিনে কে যেন তাকে একটি টাকা দিয়েছিল – সেই টাকাটিই তার একমাত্র সম্বল। রোজ একবার টাকাটি বের করে, বাজিয়ে দেখে, রুমাল দিয়ে ঘষে ঘষে আরও ঝকমকে করে তুলতে চায়। প্রাণে ধরে টাকাটি এতদিন খরচ করতে পারেনি। অনেক সময় কত কি কেনার সাধ হয়েছে, টাকাটি খরচ করবার কথা কিন্তু ভাবতে পারেনি।

এ তো টাকা নয়, ছোট্ট একটা সূর্য। সূর্যের মত আলো ঠিকরোয় এর থেকে। বরং আকাশের সূর্যের চেয়েও এটা সুন্দর। আকাশের সূর্যের দিকে চোখ তুলে তাকান যায় না — কিন্তু এর দিকে যতক্ষণ খুশি তাকিয়ে থাকো, জ্বালা-জ্বালা করে জল আসবে না চোখে, বরং জুড়িয়ে যাবে চোখ।

কিন্তু ব্যাডেনে যাওয়ার ভাড়া যদি এক টাকার বেশী হয়? ভাড়া কত ব্যাডেনের?

কে জানে কত। কতবার তো সে ট্রেনে যাতায়াত করেছে, কিন্তু ভাড়ার কথা কোনদিন কি ভেবেছে ছাই! ভাড়া দিয়ে যে ট্রেনে চলতে হয় সে-কথাই কি কখনো তার মনে হয়েছে!

জীবনে এই প্রথম এডগার রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখি হল। এই পৃথিবীতে সব কিছুর মূল্য নির্ধারিত হয় টাকা দিয়ে। টাকা টাকা! সব কিছুতেই চাই টাকা।

ঘণ্টাকয়েক আগেও সে নিজেকে চালাক ভাবত, ভাবত দুনিয়ায় নাড়িনক্ষত্র জেনে গেছে।

হায়রে! এখন মনে হয়, দুনিয়ায় কতটুকুই বা সে জানে, কিইবা জানে! এই বিরাট পৃথিবীতে সে কত ছোট, কী অসহায়!

আস্তে আস্তে এডগার স্টেশনের দিকে হাঁটতে থাকে। জীবনে তার কত স্বপ্ন ছিল — বড় হয়ে একটা কেউকেটা হবে — মস্ত বড় সেনাপতি, কিম্বা নামকরা কবি অথবা সম্রাট — দেশবিদেশে তার নাম ছড়িয়ে পড়বে, অবাক হয় সকলে ভাববে তার কথা, তার কীর্তি-কাহিনীতে ধন্য ধন্য পড়ে যাবে চারদিকে।

আর এখন!

স্টেশনের কাছে পৌঁছে আরেক ভাবনা দেখা দেয় — ব্যাডেনে যাওয়ার ভাড়া যদি এক টাকারো বেশী হয়? তাহলে? সর্বনাশ!

নির্জন স্টেশন। ওয়েটিং রুমেও কেউ নেউ। একটু ইতস্তত করে এডগার। তারপর টিকিটঘরের সামনে এসে দাঁড়ায় পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে কাউন্টারে উঁকি মেরে তাকায়, ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, 'শুনছেন, ব্যা-ব্যাডেনের ভা-ভাড়া কত?'

'কি টিকিট—হাফ না ফুল?' কাউন্টারের গর্তের মধ্যে টিকিটবাবুর চোখ জোড়া কৌতুকে ঝিকিয়ে ওঠে।

থতমত খেয়ে এডগার বলে, 'ফু-ফুল।'

'বারো আনা।'

সবেধন নীলমণি টাকাটি এডগার কাউন্টারের মধ্যে গলিয়ে দেয়। তারপর টিকিট আর চার আনা পয়সা ভালো করে গুণে নিয়ে পকেটে পোরে। পয়সাগুলো পকেটের মধ্যে ঝনঝনিয়ে ওঠে।

মিনিট কুড়ি দেরী আছে ট্রেনের। পাছে কেউ দেখে ফেলে, একটা দরজার আড়ালে এসে এডগার লুকিয়ে থাকে। কয়েকজন প্যাসেঞ্জার প্ল্যাটফর্মে পায়চারী করছে — প্রত্যেককে সে লক্ষ্য করে কিন্তু তাকে কেউ দেখতে পায় না। তবু তার ভয়, এই বুঝি তাকে দেখে কেউ ফেলল!

অবশেষে একসময় দূরে ট্রেনের বাঁশি শোনা গেলে সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

স্টেশন কাঁপিয়ে ট্রেন এসে প্ল্যাটফর্মে ইন করল। অবাক চোখে এডগার

কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে রইল ট্রেনটার দিকে। কত দূর দেশ-দেশান্তরের যাত্রী এই ট্রেনে। এই ট্রেনে করে সে-ও পাড়ি দিতে পারে অচেনা অজানা জগতে।

ট্রেণ ছাড়বার মুখে তাড়াতাড়ি গিয়ে একটা কামরায় উঠে পড়ে। একদল লোক শুয়ে-বসে চলেছে। তাদের দেখে, তাদের কথাবার্তা শুনেই বোঝা যায় ওরা কুলিমজুরের কাজ করে। এই হট্টগোলের মধ্যে একজন দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে।

তার দিকে তাকিয়ে মায়া জাগে এডগারের। ভাবে, আহা রে নিশ্চয় বড় খাটুনি ওদের, তাই ক্লান্তিতে এই হট্টগোলেও অমন করে ঘুমোতে পারছে। ওরা কাজ ক'রে টাকা রোজগার করে, — কাজ ক'রেই টাকা রোজগার করতে হয় — কিন্তু কত টাকা পাওয়া যায় কাজ করলে ?

টাকা! টাকা ছাড়া কিছু হয় না। কিন্তু এই টাকা আপনা হতেই গাছ থেকে পড়ে না, রোজগার করতে হয় টাকা।

এতদিন এদিকটা এডগারের মনেও হয়নি, যখন যা দরকার পড়েছে আপসে হাতের কাছে পেয়ে গেছে — কত ধানে কত চাল হয় কিছুই সে জানত না। টাকা রোজগারের কত উপায় আছে কে জানে — এও এক রহস্য তার কাছে — গোপন রহস্য — কিন্তু এর জন্যে তো কই, একবারো মাথা ঘামায়নি এতদিন!

এই ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বয়েস যেন এডগারের অনেক বেড়ে গেছে, হাজারো সমস্যা একসঙ্গে মনের মধ্যে জট পাকাতে শুরু করেছে। খোলা জানালা দিয়ে সে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। আদিগন্ত

মুক্ত প্রান্তর, এডগারের দুই চোখে গভীর বিস্ময়। জীবনের কী বিপুল ব্যাপ্তি!
সে ভীতু, তাই না চোরের মত পালিয়ে এসেছে? কিন্তু, পালিয়ে এসেছিল বলেই না এমনভাবে স্বাধীনতার স্বাদ পাচ্ছে! এমন ভাবে খোলা চোখে তাকাতে পারছে বাস্তব পৃথিবীর মুখোমুখি!
এডগারের যেন নবজন্ম লাভ হয়, জন্মান্তর ঘটে যায়।
চোখের সামনে অতিপরিচিত পুরনো পৃথিবীর জীর্ণ যবনিকা খসে খসে পড়ছে — একের পর এক উদ্‌ঘাটিত হয়ে যাচ্ছে রহস্যের খাসমহলের দরজাগুলি। লাইনের পাশের ঘরবাড়িগুলির যেন পাখা গজিয়েছে — সাঁ সাঁ করে উড়ে যাচ্ছে উল্টোদিকে।
আচ্ছা, — এই সব বাড়ির বাসিন্দা কারা? অবাক হয়ে এডগার ভাবে, তারা কি গরীব, না বড়লোক? তারা সকলেই কি জীবনে খুশি? এডগারের মত দুশ্চিন্তা কি ওদের কারো নেই? তার মত পৃথিবীর সব কিছু জানার উদগ্র কৌতূহল কি ওদের কারো মনেই জাগে না? ওদের ছেলেমেয়েরা কি শুধু খেলাধূলো হুটোপুটি করেই জীবন কাটায়?
লেভেল ক্রসিং-এর কাছে একটা লোক হাতে ঝাণ্ডা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল — চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল। এতদিন এডগারের ধারণা ছিল — মানুষ নয়, মস্ত বড় একটা পুতুলকে বুঝি ঝাণ্ডা-হাতে লেভেল ক্রসিং-এর কাছে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। কিন্তু এতদিনের ভুল ধারণাটা আজ তার ভেঙে গেল। পুতুল না, ও-ও একজন জলজ্যান্ত মানুষ। মিছামিছি ওখানে ও ওইভাবে দাঁড়িয়ে থাকে না —

ওটাই ওর কাজ, ওর কর্তব্য। পৃথিবীতে প্রত্যেককেই কাজ করতে হয়, নিজের নিজের কর্তব্য করে যেতে হয়। একেই বুঝি বলে জীবন-সংগ্রাম। জীবন-সংগ্রাম!

ট্রেনের ভীড় বাড়ছে। পিছনের দিকে তাকায় এডগার— অনেক দূর সে চলে এসেছে, কাছের জিনিস দূর হয়ে যাচ্ছে—একাকার হয়ে যাচ্ছে দূরের দিগন্তে।

অপরাহ্নের ধূসর ছায়া নামছে পৃথিবীর বুকে, আর গভীর কুয়াশা।

পরিচিত পৃথিবী তলিয়ে যাচ্ছে সেই কুয়াশার আস্তরণে।

আর হারিয়ে যাচ্ছে এডগারের শৈশব।

চোদ্দ

এডগার যখন ব্যাডেনে পৌঁছোল, রাত হয়ে এসেছে।

এতক্ষণ নতুনকে জানার অপরিসীম আনন্দে মন তার কানায় কানায় ভরে ছিল, রাত্রির অন্ধকারে নিজেকে একা ভেবেই আনন্দের বেলুন এখন মুহূর্তে চুপসে গেল।

এতক্ষণ দিনের আলো ছিল, লোকজন ছিল চার দিকে — চমৎকার লাগছিল। দিনের বেলাটা অনায়াসে কাটান যায় — খুশি মত ঘোরা-ফেরা করে, দোকানপসারের দিকে তাকিয়ে, পথচলতি-মানুষজনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে — সময় কাটাতে কোন অসুবিধেই তখন হয় না। কিছু ভালো না লাগে, কোন পার্কের বেঞ্চিতে চুপচাপ বসে থাকলেও চলে, শুয়ে পড়লেও কেউ কিছু বলবে না।

কিন্তু এখন? এই রাত্তিরে?

সবাই তো এবার যে-যার বাড়ির দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়বে — আর জনহীন রাস্তায় রাস্তায় চোরের মত একা-একা তাকে ঘুরে বেড়াতে হবে।

ওরেঃ বাব্বা! যে করেই হোক, রাত বাড়বার আগেই একটা আস্তানা ঠিক করে নিতেই হবে।

কোনদিকে না তাকিয়ে এডগার সোজা ঠাকমার বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করে। আবছা-আবছা মনে পড়ছে বাড়িটা — একটা রাস্তার পাশে বাগান, বাগানের শেষে বাড়ি — সেকেলে প্যাটার্নের, সবুজ রঙের।

খানিক পরেই বাড়িটা পাওয়া গেল।

পা টিপে টিপে বাগানে ঢুকে এডগার উঁকি মারে — কারো সাড় নেই, ঘরগুলো সব অন্ধকার। হয়ত ভেতরের দিকে উঠোনে চেয়ার পেতে বসে আসর জাঁকিয়ে ঠাকমা গল্প করছে সকলের সঙ্গে।

নিজের অজান্তেই এডগার দরজায় ধাক্কা দিয়ে ফেলেছিল, হঠাৎ তার মনে এক দুশ্চিন্তা দেখা দেয়। এতক্ষণ ভেবেছিল ঠাকমার কাছে একবার পৌঁছতে পারলেই হয় তাকে আর পায় কে! কিন্তু —

কিন্তু ঠাকমা যখন জিজ্ঞেস করবে, সে একা কেন, এই রাত্তিরে সে এল কোত্থেকে, কি ব্যাপার — তখন এমন এই অবস্থায় তাকে দেখলে বুড়ি তো হাজারটা প্রশ্ন করবে। সে যদি বলে যে মা'র কাছ থেকে পালিয়ে এসেছে, তাহলে?

কল্পনায় ঠাকমার মুখখানি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। শুধু এই? মা'কে যে সে মারধোর করে পালিয়ে এসেছে একথাও তো ঠাকমাকে বলতে হবে — সর্বনাশ! ভয়ে এডগারের শরীর কুঁকড়ে আসে।

দরজা খোলার শব্দ হল।

আর সঙ্গে সঙ্গে চমকে ওঠে এডগার। তারপর তারপর — কিছু ভাববার আগেই উর্ধ্বশ্বাসে দৌড় লাগায়।

ছুটতে ছুটতে থামে এসে একটা পার্কের সামনে। এবং কিছু না ভেবেই পার্কের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

পার্কটা বেশ অন্ধকার, এখানে কেউ তাকে দেখতে পাবে না। এখন একটা খালি বেঞ্চি পেলেই হয় — নিরিবিলি বসে ভেবে-চিন্তে ঠিক করতে পারে কি করবে এরপর, কি বা উচিত।

পার্কের মধ্যে সরু একটা পায়ে-চলা পথ দিয়ে এডগার এগোতে থাকে। ল্যাম্পপোস্টের ম্লান আলোয় চারপাশের গাছগুলিকে কেমন যেন ভুতুড়ে মনে হচ্ছে। খানিকটা এগিয়ে গিয়ে একটা ঢিবির উপরে সে উঠে পড়ে। এ জায়গাটা আরও অন্ধকার, অথচ মজা এই যে এখানে কেউ তাকে দেখতে না পেলেও এখান থেকে বাগানের অনেকখানিই তার চোখে পড়বে।

কিন্তু ঢিবির ওপরে বসা হয় না, কে যেন বসে আছে এক কোণে। অন্ধকারে বোঝা যায় না, তবু মনে হয়, একজন না — দুজন। এমন মশগুল হয়ে রয়েছে যে প্রথমে এডগার টেরই পায়নি তাড়াতাড়ি সে ঢিবি থেকে নেমে আসে। নিরিবিলি জায়গা চাই। তার।

এপাশ ওপাশ চারপাশে খোজাখুজি করে, মনের মতনটি আর পায় না। অন্ধকার গাছের তলা থেকে, ঝোপের ভেতর থেকে, সব জায়গা থেকে খালি ফিসফাস আওয়াজ শোনা যায়। এদিকে

ওদিকে কারা যেন আস্তে আস্তে পায়চারী করছে, চাপা স্বরে হাসছে, মিনমিন করে কাঁদছে, গুণগুনিয়ে গান গাইছে, খুনসুটি করছে।

কেমন যেন রহস্যময় গা-ছমছমে পরিবেশ।

এ কি মানুষেরই কাণ্ড, না অদৃশ্য কোন জন্তুজানোয়ারের?

সব মিলিয়ে অদ্ভুত একটা মর্মরধ্বনি উঠছে — সারা পার্ক থেকে। সমস্ত প্রকৃতি যেন ঘুমে অচেতন, কিন্তু এ ঘুমের ধরন আলাদা। ঘুমের মধ্যেও যেন প্রকৃতি নতুন ভাবে প্রাণ পেয়ে জেগে উঠেছে — অপার বিস্ময়ের ঘোর লাগে বিহ্বল এক কিশোরের চোখে। একেই কি বলে বসন্তরাত্রির যাদু?

একটি বেঞ্চির উপর নিজেকে এলিয়ে দিয়ে এডগার ভাবে — সে কত ছোট! কত বোকা! কত অসহায়!

মাথার মধ্যে সমস্ত ভাবনা চিন্তা তার এলোমেলো হয়ে যায়। নিজের কথা ভাববার চেষ্টা করে, নিজের ভবিষ্যৎ ঠিক করে ফেলতে চায়, কিন্তু কিছুতেই নিজেকে সংযত রাখতে পারে না — অন্ধকারের মধ্যে কোন রহস্যময় কণ্ঠস্বরের আভাষ পাওয়া মাত্র আপনা হতেই উৎকর্ণ হয়ে ওঠে, উন্মুখ হয়ে ওঠে সমগ্র সত্তা।

কী ভীষণ অন্ধকার চারদিকে! দুর্বোধ্য এক ধাঁধার মত থেকে থেকে এই অন্ধকার তাকে বিভ্রান্ত করে দেয়।

অথচ কি ভালোই যে লাগছে এই অন্ধকার — ভয়-ভয় করে আবার ভালোও লাগে। ওই যে অস্পষ্ট মর্মরধ্বনি, ওই যে ফিসফাস, হাসিকান্নার চাপা গুঞ্জন — কারা? কারা এসব করছে? তারা মানুষ, না অতিমানুষ? নাকি হাওয়া ছোঁয়ায় গাছের পাতারাই করছে এমন?

কান খাড়া করে এডগার। হ্যাঁ, হাওয়াই ··· উঁহু, ওই যে অন্ধকারে জড়াজড়ি করে বসে আছে দুজনে ওদের কাছ থেকেই আসছে শব্দটা। ওরা কারা? ভালো করে দেখে এডগার — একজন পুরুষ, আরেকটি মেয়ে।

কী আশ্চর্য, বাড়িঘর ছেড়ে এই রাত্তিরে পার্কের অন্ধকারে এসে ওরা অমন ঘাপটি মেরে বসে আছে কেন? করছে কি? মতলব কি ওদের? অ্যাঁ!

ইশ, এই প্রশ্নটার — শুধু এই একটি প্রশ্নের জবাব পেলেই এডগারের মন শান্ত হয়ে যাবে, তার মনের অকথ্য যন্ত্রণার অবসান হবে, এ-ক'দিনের অসহ্য অন্তর্জ্বালার হাত থেকে রেহাই পাবে।

একটি পুরুষ আর একটি মেয়ে — এমনভাবে ওরা দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরে আছে যে মনে হয় যেন একজন। মা আর বন্ধুকেও ঠিক এই রকমটাই সে দেখেছিল — তারা দুজনেও এমনি ভাবেই এক হয়ে গিয়েছিল। ···

এখানেও সেই এক ব্যাপার? সেই এক রহস্য? আশ্চর্য! আশ্চর্য!

কাদের পায়ের শব্দ শোনা গেল, খিলখিল করে কে যেন হেসে উঠল। তাড়াতাড়ি এডগার আরও পিছনে সরে যায়, অন্ধকারের মধ্যে একেবারে মিশে থাকে।

সামনে দিয়ে আস্তে আস্তে দুজনে চলে গেল, পরস্পরকে শক্ত করে জাপটে ধরে। কোন দিকে তাদের খেয়াল নেই। খানিক গিয়ে দাঁড়াল। মুখোমুখি। দুজন দুজনের মুখে মুখ চেপে ধরল। খানিকক্ষণ। তারপর

গভীর তৃপ্তিতে মেয়েটি যেন একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। জড়ানো স্বরে কি যেন বলল তার সঙ্গী।

আর একই সঙ্গে দুরন্ত ভয় ও দুর্বোধ্য এক আনন্দের রোমাঞ্চে এডগারের দেহ-মন থরথরিয়ে ওঠে। আথালি-পাথালি করে ওঠে বুক, হঠাৎ নিজেকে তার ভয়ানক একা-একা মনে হয়।

বাড়ির জন্যে, অতি-পরিচিত পরিবেশের জন্যে মনটা হঠাৎ হু হু করে ওঠে। মা-বাবা আত্মীয়-স্বজনের মুখগুলি মনে পড়ে যায়। তাদের মুখের একটি কথা শোনার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে সমস্ত মন।

নিজেদের বাড়ি! নিজের সেই ছোট্ট ঘরখানি!

তাই চায় এডগার, তাই চায়। ফিরে যেতে চায় পরিচিত পরিবেশে। আর খানিকক্ষণ এখানে থাকলেই সে দম বন্ধ হয়ে মরে যাবে।

নিজের বাড়িতে ফিরে যেতে চায় এডগার, মা-মণির বুকে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়।

কি হবে বাড়ি ফিরে গেলে? হয়ত প্রথমে সকলে খুব বকবে, বড় জোর মারবে—তারপর? তারাই তো তারপর আদর করে কাছে টেনে নেবে!

পার্ক থেকে এডগার বেরিয়ে পড়ে, আবার ছুটতে থাকে—আগের মতই ঊর্ধ্বশ্বাসে।

থামে একেবারে ঠাকমার বাড়ির সামনে সে।

দরজায় ধাক্কা দেবার আগে একবার ভালো করে তাকায় বাড়িটার দিকে। ঘরে ঘরে এখন আলো জ্বলছে, জানালা দিয়ে আলোর রোশনাই ঠিকরে আসছে। বাইরে থেকেই ঘরের ভেতরটা

যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে — কত জানাশোনা এর প্রতিটি ঘর, কত আপনার এখানের প্রত্যেকটি মানুষ!

দরজায় ধাক্কা দিতে এডগার ভুলে যায় — ভয়ে নয় আনন্দে, মুক্তির আনন্দে। এক্ষুনি তো ওই ঘরে ওই মানুষগুলির মধ্যে গিয়ে দাঁড়াবে — এই কথা ভেবেই খুশিতে সে মশগুল হয়ে ওঠে — দরজায় ধাক্কা দেবার কথা মনেও থাকে না।

হঠাৎ একটা খনখনে গলার স্বরে সে চমকে উঠল।

'ওমা, দাদাবাবু যে—তুমি এ-খে-নে!'

পিছনে তাকিয়ে দেখে, বাড়ির বুড়ি ঝি। ঝি ছুটে এসে এডগারকে জড়িয়ে ধরে।

তারপর দ্রুত সব কিছু একের-পর-এক ঘটে যেতে থাকে—ম্যাজিকের মত।

সদর দরজা খুলে গেল, সকলে ছুটে এল, ঘরে ঘরে আলো জ্বলল। একসঙ্গে সকলে কথা বলতে চাইছে, রীতিমত একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল।

বাড়ির কুকুরটা পর্যন্ত ডাক ছেড়ে অভ্যর্থনা জানায়।

ঠাকমার বুকে মুখ গুঁজে এডগার। শক্ত করে তাকে জাপটে ধরেছে বুড়ি, তার মাথায় গাল ঘষছে।

কিন্তু, ওকে — ?

এডগার কি স্বপ্ন দেখছে!

ঠাকমার পেছনে — কে ?

মা! মা-মণি!!

থরথর করে ওঠে শরীর, দু'চোখ ফেটে পড়তে চায় — তবু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এডগার। কি করবে? এখন সে কি করবে? মা'কে দেখে সে কি ভয় পেয়েছে? মা'কে কি এডি ভয় পায়?

না, মা'কে পেয়ে অসহ্য খুশিতে তার কান্না পাচ্ছে ভয়ানক?

পনেরো

হ্যাঁ, শ্রীমতীই।

সেমারিং স্টেশনে খোঁজ নিয়েই তিনি বুঝতে পারলেন ছেলে তাঁর গেছে কোন দিকে। তখন তিনি ভিয়েনায় স্বামীর কাছে এবং ব্যাডেনে শাশুড়ির কাছে 'তার' করে দেন। তারপর মেল ট্রেনে করে এডগারের আগেই তিনি চলে আসেন ব্যাডেনে। স্বামীও এলেন বলে।

এডগারকে নিয়ে সবাই বৈঠকখানায় গোল হয়ে বসল। বকাবকি বেশ একচোট হল ঠিকই, কিন্তু এত বকুনি খেয়েও এডগারের মনে কিছুমাত্র দুঃখ হয় না, কেননা সকলের মুখচোখের দিকে তাকিয়েই সে স্পষ্ট বুঝতে পারে, এ হল গিয়ে যাকে বলে স্নেহের শাসন। তাকে ফিরে পেয়ে সকলেই ভীষণ খুশি এখন।

বকার পালা শেষ হলে ঠাকমা তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করে দিলেন। এডগার অবাক। চারিদিক থেকে সকলে তাকে আদর করবার জন্যে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে। ঝি এসে জুতোমোজা খুলে নেয়, গা-হাত-পা ধুয়ে মুছিয়ে দেয়। বার বার জিজ্ঞেস করে তার খিদে পেয়েছে কিনা, কি

খেতে তার মন চায়। এডগার যেন অতি অসহায় শিশু একটি।
আগে তাকে কেউ ছেলেমানুষ ভাবলে এডগার রেগে যেত। এখন মনে হয়, ছেলেমানুষ হওয়া যেন ভগবানের আশীর্বাদ। নিজের বয়েসের কথা ভেবে ভেবে গত ক'দিন ধরে যত অশান্তি সে ভোগ করেছে, এখন কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে-সব মন থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।
হঠাৎ পাশের ঘরে টেলিফোনের ক্রিং ক্রিং বেজে উঠল। শ্রীমতী গিয়ে টেলিফোন ধরলেন ··· 'হ্যাঁ, এসেছে। ··· না, ভাবনার কিছু নেই ··· ভালো আছে।'
কই, মা তো তার কথা বলতে গিয়ে রাগ করল না? কী মিষ্টি গলা মা-মণির! এডগার অবাক হয়ে ভাবে। মা'র দু' চোখে যেন স্নেহ ঝরছে। মা — মাগো!
কী ভেবে এডগার উঠে দাঁড়ায়।
'এ কি! আবার চললি কোথা দাদু?'
ঠাকমার কথা শুনে মনে মনে হাসি পায় এডগারের। কি রকম ভয়টা পাইয়ে দিয়েছে সকলকে! তাকে উঠে দাঁড়াতে দেখেই বুড়ি ভাবছে আবার বুঝি সে প-এ-আকার দিল!
কিন্তু হায়রে, কি করে সে বোঝাবে যে, মা'র কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে সবচেয়ে বেশি দুঃখু পেয়েছে সে-ই — এডগার নিজে!
ঝি খাবার নিয়ে আসে। ঠাকমা, কাকিমা, ঝি সকলে তাকে ঘিরে বসে। এটা খা ওটা খা বলে তিনজনে একসঙ্গে তাকে সবকিছু খাবার জন্যে পীড়াপীড়ি শুরু করে।

খাবার মোটে ইচ্ছে নেই, তবু বড় ভালো লাগে এডগারের — ওদের এই স্নেহের হুকুম। কিন্তু মা?

মা-মণি গেল কোথায়? খাবার সময় মা'কে সামনে না দেখলে বড় খারাপ লাগে! —মাগো! তুমি কি বোঝ না মা, তোমার গায়ে হাত তুলেছি ভেবে এখনো আমার মন কাঁদছে!

বাইরে গাড়ি দাঁড়াবার শব্দ হল। ঠাকমা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

তারপর একসঙ্গে অনেকে কথা বলে উঠল — তার মধ্যে সবচেয়ে স্পষ্ট বাবার গলা। বাবা!

ওরে বাব্বা!

ঝি এবং কাকিমাও ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। এডগার একা — একা থাকতেই এখন আবার ভয় ভয় লাগে। বাবাকে যে বাঘের মত ভয় করে।

ছেলে বাপকে ভয় করুক এই হয়ত ভদ্রলোক চান। নিজেও তিনি খুব রাশভারি মানুষ।

বারান্দায় বাবার গলা শোনা যাচ্ছে। খুব রেগে গেছেন, চিৎকার করে কথা বলছেন। ঠাকমা আর মা তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করছে। এগিয়ে আসছে বাবার পায়ের দুপদাপ শব্দ।

তারপর — সশব্দে দরজা খুলে যায়।

দশাসই চেহারার মানুষ, বাপের সামনে এডগারকে দেখায় ছোট্ট একটা ডল পুতুলের মত।

গর্জন করে বাপ বলেন, 'এই বদমাস, মা'র কাছ থেকে কেন এভাবে পালিয়ে এসেছিলি — উঁঃ ?'

ভদ্রলোক সত্যি সত্যি ভয়ানক রেগে গেছেন।

তাড়াতাড়ি শ্রীমতী এসে স্বামীর পিছনে দাঁড়ালেন। বাবার ছায়ায় মা'র মুখখানি ঢাকা পড়ে যায়। আড়াল থেকে মা যেন মাথা নেড়ে কি বলেন, এডগার বুঝতে পারে না। সে চুপ করে রইল।

'কি ? মুখে কথা নেই কেন ? বলি, হয়েছিল কি ? ভালো চাস তো সব খুলে বল, কিছু বলব না তাহলে। কেউ বকেছিল ? মারধোর করেছিল ?'

এডগার থতমত খায়। ভেতরে ভেতরে মেজাজ তার ফের বিগড়ে যেতে থাকে। মিছিমিছি মুখ বুজে বকুনি খাবে নাকি ? শখ করে কি সে পালিয়েছিল ? শখ করে কোন ছেলে পালায় মা'র কাছ থেকে ? বলবে কেন পালিয়েছিল ?

মুখ তুলে মার দিকে তাকাল। এখনো তিনি বাবার আড়ালে দাঁড়িয়ে। একটু-একটু দেখা যাচ্ছে মুখখানি। একবার তিনি নড়ে-চড়ে উঠলেন।

তারপর আস্তে আস্তে ডান হাতের তর্জনী তুলে ঠোঁটের উপর রাখলেন — ছায়ান্ধকারের মধ্যে চঞ্চল চোখ দুটি তাঁর কি যেন বলতে চাইল।

হঠাৎ বুকে বল পায় এডগার, হারানো সাহস ফিরে আসে। সেই গোপন ব্যাপারটা গোপন রাখতে বলছে মা — মা-মণি মিনতি করছে তার কাছে !

মা তার সাহায্য ভিক্ষে করছে।

মা — মা-মণি! গর্বে বুক ভরে ওঠে।

এডগার সোজা হয়ে দাঁড়াল, 'না বাপি, কেউ আমায় কিচ্ছু বলেনি— মা আমায় ব'লে কত ভালবাসত। ··· আমি ··· আমি নিজেই দুষ্টুমি করে পালিয়েছিলুম, বাপি।'

ভদ্রলোকের চোখ জোড়া সন্দেহে কুঁচকে যায়। তিনি যেন অন্য কিছু প্রত্যাশা করেছিলেন। ছেলের এই শাদা-সরল স্বীকারোক্তিতে বড় যেন হতাশ হন।

'বেশ। এবার কিছু বললাম না। কিন্তু ফের যদি এমন কাণ্ড কর — পিঠের ছাল ছাড়িয়ে নেব বলে রাখছি।' পর মুহূর্তেই তিনি আবার স্বর নরম করে আনেন, 'এত রোগা হয়ে গেছিস কেনরে খোকা! কত লম্বা হয়েছিস! এ ক'মাসেই বেশ বড়সড় হয়ে উঠেছিস! আর তো তুই ছেলে মানুষ নস বাবা, বুদ্ধিসুদ্ধি হয়েছে — এবার একটু ভেবে চিন্তে চলবি — কেমন?'

মা'র দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে এডগার। কেমন ঝকঝক করছে মার চোখ দুটি, কী স্নেহসুন্দর দৃষ্টি! মা'র এমন চোখ এমন দৃষ্টি আগে সে আর দেখেনি। সারা মুখে এক গভীর পরিতৃপ্তির ছাপ। শুধু পরিতৃপ্তির নয় — অপরিসীম কৃতজ্ঞতারও!

এবার এডগারকে শুতে পাঠিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু একা-একা শুতে যেতে বলায় আজ একবারো প্রতিবাদের কথা মনে হয় না তার। মাথার মধ্যে এখন নানান ভাবনা পাক খাচ্ছে। জীবনে আজ এক নতুন অভিজ্ঞতা হল, অতি বাস্তব অদ্ভুত এক অভিজ্ঞতা — দৃষ্টি

এখন তার বাস্তব পৃথিবীর দিকে। গত ক'দিনের সমস্ত অন্তর্জ্বালার লেশ মাত্র আর নেই।
এ জীবন অনেক বড়, বহুবিচিত্র রহস্যে রোমাঞ্চিত এই জীবন। জীবনের নগ্ন রূপটির পরিচয় সে আগে পেয়েছে — মিথ্যা ও প্রবঞ্চনায় ভরা সে-জীবন, অন্যায় অনাচার আর দুর্নীতির সমারোহ সে-জীবনে। সে-জীবনকে সে ঘৃণা করে।
কিন্তু এমন মনে হয়, কাউকে ঘৃণা করা, কোন কিছুকে হেনেস্থা করা একেবারে ছেলেমানুষী, চরম বোকামি। এমন কি স্টার্ণফেল্ডের প্রতি — তার জীবনের সবচেয়ে বড় শত্রুর প্রতিও এখন তার কৃতজ্ঞতা জাগে। স্টার্ণফেল্ডের জন্যেই না জীবনের এই নতুন দিকটি উদঘাটিত হয়ে গেল। নতুন মানুষ হতে পারল!
অন্ধকারে চুপচাপ শুয়ে আছে এডগার। গর্বে আনন্দে পরিতৃপ্তিতে হৃদয়-মন ভরে উঠছে। ঘুম নেই — ঘুম বুঝি আর আসবে না চোখে।
... হঠাৎ তার মনে হয়, ঘরের মধ্যে কে যেন পা টিপে টিপে ঢুকল, পাশে এসে দাঁড়াল — তারপর আস্তে আস্তে বিলি কাট্‌তে শুরু করল তার চুলে, গালের ওপর গড়িয়ে পড়ল ঈষদুষ্ণ কয়েক বিন্দু অশ্রু। ... একটি কথাও না বলে শ্রীমতী তাকে চুমু খেলেন — অনেকক্ষণ ধরে। পরে, বড় হয়ে, এডগার বুঝেছিল এই নিঃশব্দ অশ্রুর আর থরথর চুম্বনের মানে কি!
মা যেন সন্তানকে স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করলেন — এবার থেকে ছেলের জন্যে একান্ত করে নিজেকে তিনি সঁপে দেবেন, তাঁর সমস্ত ভালোবাসা

উজাড় করে দেবেন সন্তানের প্রতি। আগুন নিয়ে খেলা তিনি আর করবেন না — না না — জৈবিক আনন্দের মোহে আর কখনো আত্মবিস্মৃত হবেন না। ছেলের ওপর কৃতজ্ঞতার শেষ নেই তাঁর, অসহ্য এক অবমাননার হাত থেকে ছেলেই আজ তাঁকে বাঁচিয়েছে — ছেলের মুখে চেয়েই বাঁচবেন তিনি।

এসব কথা অবিশ্যি এডগার এখন বুঝতে পারল না। হাজার হলেও এখনো তো ছেলেমানুষ! তবে এটুকু সে বুঝল, একান্ত করে কারো ভালোবাসা পাওয়ার চেয়ে বড় আর কিছু নেই পৃথিবীতে। আর এই ভালোবাসা, এডগার জানে না কেন, বৃহত্তর জীবনের গভীর গোপন রহস্যেরই এক অচ্ছেদ্য অংশ।

একটু পরে শ্রীমতী তেমনি সন্তর্পণে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু এডগারের মনে হল, এখনো যেন মা তার পাশেই রয়েছেন, মা'র দুটি নরম ঠোঁট এখনো যেন তার ঠোঁট দুটিকে চেপে ধরে আছে। শির শির করছে তার সমস্ত শরীর।

ধীরে ধীরে ঘুমের অতলে তলিয়ে যেতে যেতে কেমন এক রিমঝিম নেশার আমেজে এডগারের মনে হয় — নরম দুটি ঠোঁট প্রাণপণ শক্তিতে চেপে ধরুক তার ক্ষুধার্ত ঠোঁট দুটিকে।

গত ক'দিনের সমস্ত ঘটনা অস্পষ্ট ছায়াছবির মত চোখের ওপর দিয়ে চকিতে ভেসে যায় — মিলিয়ে যায় চিরকালের মত। এক দুর্ঘটনার ঝোড়ো হাওয়ায় খুলে গেছে জীবন-গ্রন্থের নতুন পাতা। শিশু এডগার ঘুমিয়ে পড়ে।

আর ধীরে ধীরে উন্মোচিত হতে থাকে যৌবন-স্বপ্নের পাঁপড়িগুলি।



● জীবনের গতিপথে বারবার প্রদোষের ছায়া পড়ে। জানা থেকে অজানায়, দিন থেকে রাত্রি ঘনায়। কৈশোরের তট-প্রান্ত ছুঁয়ে যৌবনের বন্যা আসার সন্ধিক্ষণে কুয়াশা দেখা দেয় অর্ধস্ফুট অনুভূতির। এমনই এক কুয়াশায় একটি কিশোরের দিক-ভ্রান্তির কাহিনী 'অন্তর্জ্বালা'।
সে বেড়াতে এসেছে মায়ের সঙ্গে নতুন দেশে, বাবাকে ছেড়ে। এই অচিন দেশে যে লোকটি মিশতে চাইছে মায়ের সঙ্গে তার চলনে বলনে এক অস্বস্তিকর রহস্যের ছায়া। সেই রহস্য-রাহু মাকেও বুঝি গ্রাস করে। এই দু'জনের মধ্যেকার দুর্জ্ঞেয় সম্পর্কের সূত্রটি কি ? কিশোর সেটি জানতে চায়, তাই তার গা-ছমছম গোয়েন্দাগিরি। চলমান কিশোরের চেতনা দিয়ে আগামী যৌবনের দেহচকিত অনুভূতির স্বাদ নিতে চায় সে। তার সন্দেহ মায়ের প্রতি নয়, নতুন বন্ধুকেও সে সন্দিগ্ধচিত্তে দেখে না, তার মনে হয় তার অর্ধজাগ্রত চেতনার প্রদোষমুহূর্তটিই বুঝি রহস্যের জাল দিয়ে বোনা!

জাগ্রত ইয়োরোপের অন্যতম শেষ কৃষ্টিধর স্টিফান জাইগের নিঁখুত রচনায় সেই প্রদোষকালের রক্তাভা ফুটে উঠেছে। শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনবদ্য অনুবাদ সেই বর্ণালীর যথার্থ অনুলিপি। অক্ষুণ্ণখ্যাতি প্রেমেন্দ্র মিত্রের মিতবাক ভূমিকা এই বইয়ের কৌলিন্য বৃদ্ধি করেছে। ●